তারিখ পত্র   এব ২।

সা[illegible] এবং

the [illegible]জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়

ও

কয়েকটী উপদেশ

ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

নববিধান পাবলিকেশন কমিটী
৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়*।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অসদ্‌ভাব অসম্মিলন দর্শন করিয়া মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। আহা! পূর্ব্বে যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করি, সে কি সুখের অবস্থা ছিল! তখন একজন ব্রাহ্মভ্রাতাকে দেখিবামাত্র হৃদয় মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, তাঁহার সদ্‌ভাব দেখিয়া হৃদয় ভক্তিভাবে গদ গদ হইত। হায়! সেই সুখের অবস্থা কে হরণ করিল? এখনকার শোচনীয় অবস্থা যে আর সহ্য করা যায় না। চতুর্দ্দিকে মহামারী উপস্থিত—ভ্রাতা ভ্রাতাকে নির্য্যাতন করিতেছেন, কেহ বা নির্জ্জনে ভ্রাতার নিন্দা করিয়া আমোদ করিতেছেন, কেহ বা ভ্রাতাকে অপদস্থ করিবার জন্য প্রকাশ্য পত্রিকায় ভ্রাতার জীবনের সমালোচনা করিতেছেন, প্রচারকদিগকে প্রকাশ্যে গালি বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহারাও তীব্র সমালোচনায় গাত্র জ্বালা নিবারণ করিতেছেন। পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এরূপ দুর্দ্দশা কেন হইল? ইহা চিন্তা করিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

*প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

আমি যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি এবং যে যে কারণে ব্রাহ্মসমাজে পরিবর্ত্তন ও আন্দোলন দর্শন করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। স্বীয় হস্তে আপনার বিষয় লিখিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতে হয়, এজন্য যাহা লেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। প্রচার বিবরণ আদ্যোপান্ত বিস্তাররূপে উল্লেখ করিলে সকলেরই রুচিকর হইত। কিন্তু সমস্ত বিবরণ উল্লেখ করিলে পুস্তকখানির আয়তন অত্যন্ত অধিক হইত সুতরাং অর্থাভাবে তাহা সম্যক্‌রূপে উল্লেখ করিতে পারি নাই।

এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া আমি জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইব তাহা বিলক্ষণ জানি। তথাপি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া এক ব্যক্তিও যদি বিনীত, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল ও পরিত্রাণার্থী হইয়া পবিত্র ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনের ব্রত মনে করিয়া, প্রতিদিন তাহা সাধন করেন এবং একমাত্র পবিত্র ব্রহ্মোপাসনাকেই ব্রাহ্ম নামের পরিচায়ক এবং যে কার্য্যে ব্রহ্মোপাসনা হয় না তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য নহে, এরূপ মনে করেন, ও ব্রহ্মোপাসনা না করিলে ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র ইহাতে যদি দৃঢ়বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে সকল উপহাস গ্লানি সহ্য করিয়া আনন্দ লাভ করিতে সক্ষম হইব।

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! বড় আশা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম ব্রাহ্মসমাজই এক মাত্র শান্তিস্থান, ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদের সহবাস আনন্দ-নিকেতন। বর্ত্তমান সময়ে দারুণ অশান্তি আসিয়া ব্রাহ্মসমাজকে অধিকার করিয়াছে। যাঁহাদের সহবাসে আনন্দ অনুভব হইত, এখন তাঁহাদের সংসর্গে

আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কলিকাতা
১লা আষাঢ় ১৭৯৪শক
(১৮৭২ খৃঃ)

নিবেদক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকখানি দ্বারা ব্রাহ্ম-সাধারণের বিশেষ হিত সাধিত হইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি এই পুস্তকের আরও বহুল প্রচার হওয়া প্রার্থনীয় বলিয়া এবং প্রথমবারের পুস্তক সমুদায় নিঃশেষিত হওয়ায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক প্রচার বিভাগ হইতে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইল। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই পুস্তকের স্বত্ব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে প্রদান করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। এবারে কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত এবং নূতন লিখিত হইয়াছে, সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা ইহার পূর্ব্ব মূল্য চারি আনা স্থলে তিন আনা করিয়া দিলাম।

৫৬ ব্রাহ্ম সংবৎ
অগ্রহায়ণ
(১৮৮৬ খৃঃ)

প্রকাশক।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান যুগে মানবজাতিকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করার জন্য বিশ্ববিধাতা তাঁর নূতন বিধানে কত আয়োজন করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের এবং প্রচারক মহাশয়দের জীবনে তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের ভিতর অনেকে আত্মজীবনী রচনা করে তার ছবি এঁকে রেখে গেছেন। এই বইটী তার ভিতর একটী। যদিও ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ পরবর্ত্তী জীবনে ব্রাহ্মসমাজ থেকে দূরে ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সাধনের এবং ইতিহাসের ভাবধারার দিক থেকে বইটীর প্রয়োজন আছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমতি নিয়ে বইটী পুনঃপ্রকাশিত করা হল। এই সংস্করণে কয়েকটী তারিখ ফুটনোট এবং 'ধর্ম্মতত্ত্ব' থেকে সঙ্কলন করে নয়টী উপদেশ সংযোগ করা হল।

কলিকাতা
১লা আষাঢ়, ১৩৫৩
(১৯৪৬)

প্রকাশক।

দুঃখের উৎপত্তি সন্দেহ নাই। ভ্রাতৃগণ! ব্রাহ্মসমাজে এই অবস্থা প্রবেশ করিল কেন? তাহা প্রকাশ করিতে হইলে স্বীয় জীবনে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়াছি তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলেই স্বীয় জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়। এজন্য আমার জীবনে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছি তাহা প্রকাশ করাই আমার বিশেষ উদ্দেশ্য। স্বীয় জীবন চিন্তা করিলে অনেক সময় মন প্রফুল্ল হয়, কখন বা শোক দুঃখে মুহ্যমান হয়। স্বীয় জীবন আলোচনা করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। কারণ ব্রাহ্মসমাজ সমালোচনা করিতে হইলে স্বীয় জীবনের আলোচনা না করিলে আলোচনা পূর্ণ হইতে পারে না। অতএব আমার জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মকে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

পূর্ব্বে বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মে আমার বিশেষ আস্থা ছিল। সে ভক্তির অবস্থা স্মরণ করিতেও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। হিন্দুধর্ম্মে পূর্ণবিশ্বাসী ব্যক্তির যে যে লক্ষণ থাকা উচিত, তাহা সমস্তই আমাতে বর্ত্তমান ছিল। দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই আমাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতেন। কিন্তু অসত্য কুসংস্কার চিরদিন মনুষ্য হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। যে হিন্দু শাস্ত্র হিন্দু ধর্ম্মের সংরক্ষক, সেই হিন্দু শাস্ত্রই আমার আন্তরিক কুসংস্কারের উন্মূলক হইল। হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঘোর বৈদান্তিক হইয়া পড়িলাম, তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম—অহং ব্রহ্ম, এই সত্য বিশ্বাস করিতাম, উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না। এই সময়ে আমার এক শিষ্য আমার পদ পূজা করিতেছিলেন—আমি মন্ত্র পড়াইতেছিলাম, হঠাৎ আমার মনে হইল যে, আমাতে এ সকল ক্ষমতা নাই, আমি স্বয়ং কিরূপে পরিত্রাণ পাইব তাহার নিশ্চয় নাই, আমি পরিত্রাণ করিব কিরূপে? দূর হউক, এরূপ কপট আচরণ আর করিব না। ইহার পূর্ব্বে আর একটী ঘটনা হয়—আমাকে কে ডাকিয়া বলিল পরলোক চিন্তা কর। কে বলিল, লোক দেখিলাম না। ভয়ে জ্বর হইল।

এই সময়ে বগুড়া জেলায় গমন করি। সেখানে তিনজন সাধু ব্রাহ্মের (কিশোরীলাল রায়, হারাধন বর্দ্ধন, গোবিন্দচন্দ্র পাঁড়ে) সহিত আলাপ হওয়াতে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম, সেখানেই প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের কথা শ্রবণ করিলাম। ইহার পূর্ব্বে এই মাত্র জানিতাম যে, কলিকাতায় একদল ব্রহ্মজ্ঞানী আছে, তাহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া সুরাপান মাংস ভোজন করে।

এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানীর নাম শ্রবণ করিলেই আমি বিরক্ত হইতাম। কিন্তু বগুড়াতে তিনজন ব্রাহ্মের বিশুদ্ধ জীবনে আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাদের সহিত অকৃত্রিম বন্ধুতাসূত্রে নিবদ্ধ হইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। তাঁহাদের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলাম বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মই রহিলেন, আমি বৈদান্তিকই রহিলাম। ভিন্ন মত হইলে যে প্রণয় হয় না ইহা সকল স্থানে সত্য নহে। যাহা হউক আমাকে ব্রাহ্ম করিবার জন্য তাঁহাদের সম্পূর্ণ যত্ন। তাঁহারা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে আমাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন।

আমি বগুড়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া এক জন বন্ধুর দুশ্চেষ্টায় অত্যন্ত কষ্টে পড়িলাম। তিনি আমার সমস্ত অর্থ লইয়া জুয়া খেলিয়া পলায়ন করেন। আমার নিকট এক পয়সাও ছিল না, অথচ কলিকাতায় থাকিয়া সংস্কৃতকালেজে অধ্যয়ন করিতেও অত্যন্ত অনুরাগ। কলিকাতায় অবস্থিতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলাম। কোন সুবিখ্যাত দয়াবান্ বাবুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার বাসাস্থ কতিপয় ভদ্রসন্তানের দুর্ব্যবহারে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আর কাহাকে বাসায় স্থান দান করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই আমি তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া কোন ভক্তিভাজন ঠাকুর মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলাম। তিনি আমার আবেদন পত্র লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এ কার্য্যে তাঁহার প্রতি আমি বিরক্ত হইলাম না, কারণ বগুড়াস্থ বন্ধুত্রয় ঠাকুর বাবুর বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। মনে করিলাম অনেক লোকে ইহাঁদিগকে প্রবঞ্চনা করে এ জন্য আমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন না। দিবসে উপবাস রাত্রিতে গোলদীঘিতে কালেজের বারেণ্ডায় শয়ন এই অবস্থায় তিন চারি দিবস অতিবাহিত করিলাম। কলিকাতায় অনেক বন্ধু বান্ধব ছিলেন, কিন্তু বিপদ কালে তাঁহাদের নিকট গমন করিলে কোন প্রকার অবজ্ঞা দেখিয়া পাছে বন্ধুতা বিনষ্ট হয় এই আশঙ্কায় তাঁহাদের নিকট গমন করিলাম না। যাঁহার জন্য আমার এত কষ্ট, এই সময়ে সেই বন্ধুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধুতার অনুরোধে তাঁহাকে কোন ভর্ৎসনা না করিয়া দুইজনে একজন ভদ্রলোকের বাসায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এই ভদ্রলোকটী সুরাপান সভার সভাপতি। এখন যাঁহাদিগকে বড় ব্রাহ্ম বলিয়া দেখিতেছি, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া সুরা সেবন করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা আমাকে সুরাপায়ী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন,

আমি প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার পূর্ব্বক সুরার নিন্দা করিতাম। আমি অদ্বৈতবংশ গোস্বামী, আমি সুরাপান করিলে অথবা অন্য কোন পাপাচরণ করিলে আমার নির্ম্মল পিতৃকুল কলঙ্কিত হইবে, কেবল এই সংস্কারে অনেক সময় আমাকে কুসঙ্গ নরক হইতে রক্ষা করিয়াছে। সেই অবধি তাঁহারা আমাকে গোপন করিয়া সুরাপান করিতেন। সুরাপান নিবারণ বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্মের শাসন অতি চমৎকার! ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং ইংরাজদিগের সহবাস, খৃষ্টান্ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, বিলিতি সভ্যতার বাহিক আকর্ষণ এই সকল কারণে সুরাপান ভারতবর্ষে অধিক প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির একটীরও সাহায্য না পাওয়াতে ঘোর পাড়াগেঁয়ে অসভ্য হইয়া সুরাপায়ীদিগকে বিলক্ষণরূপে গালি বর্ষণ করিতাম। তখন আমি অসভ্য না থাকিলে নিশ্চয়ই প্রধান প্রধান লোকের ন্যায় আমিও সুরাপায়ী হইতাম, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এই দুঃখের সময় এক দিন মনে হইল যে বগুড়াস্থ বন্ধুত্রয় ব্রাহ্মসমাজে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, অদ্য বুধবারে একবার ব্রাহ্মসমাজে যাইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ দেখিবার পূর্ব্বে আমার সংস্কার ছিল যে ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেবল তবলা বাজাইয়া গান করে, বেদ পাঠ করে, অবশেষে সুরাপান ও মাংস ভোজন করে। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কতদূর অজ্ঞতা থাকিতে পারে, তাহা আমি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছি। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলাম। সমাজের আলোক মালা, তাল মান সংযুক্ত মধুর সংগীত, ভক্তিভাবে স্তোত্র পাঠ, বহু সংখ্যক লোকের গম্ভীর ভাব এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আমি ব্রাহ্মসমাজকে স্বর্গধাম বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম। আমার পূর্ব্বের সংস্কার তিরোহিত হইল। পরে ভক্তিভাজন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্গীয় ভাবে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। "পাপীর দুর্দ্দশা—ঈশ্বরের বিশেষ করুণা" এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমার পূর্ব্বকার ভক্তিভাব স্মৃতি পথে উদিত হইল, এতদিন যে ইষ্ট দেবতার পূজা করি নাই তজ্জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, সমস্ত শরীর গলদ্‌ঘর্ম্মে কম্পিত হইতে লাগিল, অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিয়া অন্তরে দয়াময়ের নিকট এই প্রার্থনা করিলাম যে, 'দয়াময় ঈশ্বর! প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস হয় না, অন্য কোন ধর্ম্মেও আমার বিশ্বাস নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার ন্যায় হতভাগ্য বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যখন পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল তখন ইষ্ট দেবতার পূজা করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতাম

এখন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। এই মাত্র শুনিলাম তুমি অনাথের নাথ, প্রভো! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাকে রাখ, আর আমি কোথাও যাইব না, তোমার দ্বারে পড়িয়া রহিলাম।' এই প্রার্থনা করিবামাত্র হৃদয় অনেক পরিমাণে শান্তি লাভ করিল। তখন মনে করিলাম শান্তি লাভের এমন সহজ উপায় থাকিতে আমি কত অশান্তি ভোগ করিয়াছি। দয়াময় ঈশ্বর অদ্য আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছেন, আমারই উদ্ধারের জন্য ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রবাবু অদ্য এই হৃদয়ভেদী বক্তৃতা করিলেন। মনে মনে দেবেন্দ্রবাবুকে ধর্ম্ম জীবনের গুরু বলিয়া ভক্তিযোগে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে চলিয়া আসিলাম। প্রতিদিন প্রার্থনা করিয়া কি অপার শান্তি লাভ করিতে লাগিলাম তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইত, তখনই নির্জ্জনে প্রার্থনা করিয়া দয়াময় পিতার নিকট প্রশ্ন করিয়া উপযুক্ত উত্তর প্রাপ্ত হইতাম। যে দিন যে সত্য লাভ করিতাম তাহা লিখিয়া রাখিতাম। সেই লেখাগুলি সংগ্রহ করিয়াই 'ধর্ম্মশিক্ষা' পুস্তকখানি প্রকাশ করা হয়। যখন পুস্তকখানি প্রকাশ করি, তখন মনে করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত হয়ত আমার পুস্তকের মিল হইবে না; কিন্তু যখন ভক্তিভাজন কেশববাবু পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনুমোদন করিলেন, তখন আমার আহ্লাদের সীমা পরিসীমা রহিল না। বিশ্বাস আরো দৃঢ় হইল। দয়াময় পরমেশ্বর যে গুরু হইয়া অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

অন্তরে দয়াময়ের চরণাশ্রয়ে শান্তি লাভ করিয়া বগুড়ায় গমন করিলাম। বগুড়ায় বন্ধুগণ আমার পরিবর্ত্তন দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া মেডিকেল কলেজে ভরতি হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। কলিকাতায় আসিবার সময় কিছুদিন শান্তিপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। একদিন আলোচনা করিতেছি যে, পরমেশ্বর সমস্ত মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি সকলের পিতা মাতা। এইজন্য প্রত্যেক নরনারীকে ভ্রাতা ভগ্নী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সকলেরই অন্তরে বাস করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, সুতরাং মনুষ্য মনুষ্যকে ঘৃণা করিলে মহাপাপ হয় সন্দেহ নাই। অতএব জাতিভেদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া বিশ্বাস করা হয় না। এই বিষয় আলোচনা করিতেছি এমন সময়ে একাদশ বর্ষ বয়স্ক একটী বালক বলিয়া উঠিল যে, যদি তুমি জাতিভেদ না মান

তবে পইতা রাখিয়াছ কেন? তৎক্ষণাৎ বালকের কথা ঠিক্ বোধ হইল, তখনই তাহার সাক্ষাতে উপবীত ত্যাগ করিলাম। বালকটী তখনই আমার মাতা ঠাকুরাণীর নিকট উপবীত ত্যাগের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। মাতা-ঠাকুরাণী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে গমন করিলেন দেখিয়া পুনর্ব্বার উপবীত গ্রহণ করিলাম। পরে মেডিকেল কালেজে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। এই সময়ে শ্রবণ করিলাম যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়। ইহা শুনিয়া দীক্ষিত হইতে অত্যন্ত অভিলাষ হইল। দীক্ষিত হইলে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হয়, সুতরাং অবিলম্বে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রবাবুর নিকট দীক্ষিত হইলাম (১৮৬০ খৃঃ)।

উপবীত ত্যাগ না করাতে আমার মনে অত্যন্ত অশান্তি হইতে লাগিল। এমন কি প্রতিদিন প্রার্থনার সময় হৃদয় কম্পিত হইত। লোকে বলে "পইতা কি গায়ে কামড়ায়?" বাস্তবিক ইহা কাল ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিদিন দংশন করিতে লাগিল। উপবীত রাখা অসত্য ব্যবহার। অসত্য ব্যবহার করিলে ঈশ্বর দর্শন হবে না। এই ভয়ে আমার প্রাণ অস্থির হইত। এক দিন ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে 'মহাশয়! উপবীত রাখা উচিত কি না, মৎস্য মাংস ভক্ষণ করা উচিত কি না?' তিনি উত্তর করিলেন— "উপবীত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপবীত না রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ আমি উপবীত রাখিয়াছি। মৎস্য মাংস না খাইলে শরীর রক্ষা হয় না, মশা ছারপোকা যখন মার, তখন অন্য জীব হত্যায় দোষ কি?" এই দুই উত্তরই আমার মতের সহিত ঐক্য হইল না। মনে করিলাম এখনও ব্রাহ্মসমাজে কুসংস্কার রহিয়াছে। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু আমাকে যে পাপ কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার দূষিত মতের জন্য তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা হইল না।

পূর্ব্ববাঙ্গালাবাসী মেডিকেলকালেজের কতিপয় ছাত্র একত্রিত হইয়া "হিত-সঞ্চারিণী" নামে একটী সভা করিয়াছিলেন। এক দিন সেই সভায় আলোচিত হইল যে, যাহা সত্য বুঝিব তাহা প্রতিপালন না করা মহাপাপ ও কপটতা। সেই আলোচনার পরেই (১৮৬২ খৃঃ) উপবীত ত্যাগ করিয়া পাপ ভার হইতে মুক্ত হইলাম। বাটীতে পত্র লিখিলাম। বাসায় তর্কের ধূম উঠিয়া গেল। দেবেন্দ্রবাবুর উপবীত আছে, অতএব অনেকে আমাকে উপবীত গ্রহণ

করিতে অনুরোধ করিলেন। যে সোমপ্রকাশ সম্পাদক এখন জাতিভেদ রাখিতে বিশেষ যত্ন করিতেছেন, তখন তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজ যে উপবীত ত্যাগের বিরোধী, ইহা বলিয়া ব্রাহ্মসমাজকে দোষারোপ করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার বিপরীত মত।

এই সময়ে উৎসাহে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে লোকের অধর্ম্ম পাপ দেখিয়া অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। একদিন মনে হইল পথে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব। সেই দিন অপরাহ্নে প্রেসিডেন্সি কালেজের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল সত্যগুলি প্রচার করিতে লাগিলাম। চারি পাঁচ শত লোক একাগ্রমনে শ্রবণ করিতে লাগিল। কিছু দিন এইরূপ করাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। ইহাতে লোকের প্রতি দয়া হয়, সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি হয়, সত্যের মহিমা দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

সঙ্গত সভার[১] সাম্বৎসরিক অধিবেশনে গমন করিয়া 'অনুষ্ঠান' নামে একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইলাম। তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, তাহাতে লিখিত আছে যে, "উপনয়নের সময় উপবীত গ্রহণ করিবে না"[২] ইহা পাঠ করিয়া মনে করিলাম যে উপবীত ত্যাগ করা সঙ্গত সভার মত অতএব এই সভাতে গমন করিতে হইবে। পূর্ব্ববাঙ্গালাবাসী একজন ভ্রাতার সহিত গমন করিয়া সঙ্গতের সভ্য হইলাম। ইহার পূর্ব্বে ভক্তিভাজন কেশববাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল না। সঙ্গতে নিত্য নূতন সত্য লাভ করিয়া ভক্তিভাজন কেশববাবুর নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতে লাগিলাম। সঙ্গতেই অধিকাংশ ব্রাহ্ম ভ্রাতার সহিত

১। সঙ্গতসভা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক ১৮৬০ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সঙ্গতসভা' নামটী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শিখদের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ সভার নামানুসারে নামকরণ করেন। ইহার তিনটা শাখা ছিল—একটী আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কোলুটোলা বাটীতে; অন্য দুটী সিমলায় এবং কোলুটোলার অন্যত্র। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বাটীতে প্রথম বৎসর যে আলোচনা হয় তাহা তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' নামে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৮২ শক (শ্রাবণ ও ভাদ্র) ও ১৭৮৩ শক (অগ্রহায়ণ ও পৌষ) সংখ্যায় প্রকাশ করেন; ১৮৬২ খৃঃ ঐগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সঙ্গত সভার যে সকল আলোচনা লিপিবদ্ধ হয় তাহা 'সঙ্গত' ১ম ও ২য় ভাগে নববিধান পাব্‌লিকেশন কমিটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহা পড়িয়া নিজের উপবীত ত্যাগ করেন।

পরিচিত হই। ব্রাহ্মভ্রাতাদের সহবাসে কি অসীম আনন্দ ভোগ করিতাম তাহা স্মরণ করিয়াও এখন হৃদয় আনন্দিত হয়। সঙ্গত এবং ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়াই মনে হইত আবার কখন সঙ্গতে গমন করিব, সমাজে গমন করিব, ব্রাহ্মভ্রাতাদের সহিত সম্মিলিত হইব। তখন আমি প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগের নিকট অপরিচিত ছিলাম, এজন্য তাঁহাদের বাটীতে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে কোন অনুষ্ঠান হইলে আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেন না। কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই বলিয়া আমি অভিমান করিয়া বাসায় থাকিতে পারিতাম না। সেখানে গমন করিলে ব্রহ্মনাম শ্রবণ করিব, ভ্রাতাদের সহিত সম্মিলিত হইব, এই ভাবিয়া সর্ব্বত্রই গমন করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতাম। ধর্ম্ম জীবনের এই বাল্য ব্যবহার জীবনে না থাকিলে অভিমানে মন সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত থাকে, ভ্রাতাদিগের সহিত সরল ব্যবহার করা যায় না। তখন প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বোধ হইত। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত সামান্য উপদেশও বহুমূল্য বোধ হইত। ভ্রাতাদের মুখশ্রী আনন্দমাখা বোধ হইত। তখন ভ্রাতাদেরই সহিত সম্বন্ধ—ভগ্নীগণ এখনও ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিয়া পিতার শান্তি রাজ্য দর্শন করেন নাই। হায়! সেই শান্তি রাজ্য এখন কোথায়?

এই সময়ে একবার শান্তিপুরে বাটীতে গমন করিলাম। আমি গমন করিবামাত্র মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। শান্তিপুর শুদ্ধ লোক আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। পথে বহির্গত হইলে কেহ গালি দিত, কেহ ধূলি নিক্ষেপ করিত, কেহ বা প্রহার করিতে উদ্যত হইত। যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও বাতুল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম হিন্দু সকলেই আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিতে লাগিলেন। এদিকে মাতাঠাকুরাণী উপবীত আনিয়া প্রদান করিলেন, তাহা আমি গ্রহণ করিলাম না দেখিয়া তিনি আমার পায়ে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন! মাতা ঠাকুরাণীর এইরূপ ব্যবহারে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চেতন হইয়া বলিলাম যে, 'যদি আমাকে পুনর্ব্বার উপবীত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব, আমি আর অসত্যকে ধারণ করিব না।' মাতা ঠাকুরাণী আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, "তুমি আর পইতা গ্রহণ করিও না, যখন তোমার পইতা হয় নাই তখন যেরূপ ছিলে এখনও তাহাই মনে করিব—তুই বেঁচে থাক্।" মাতার এই আদেশ শুনিয়া মনে মনে দয়াময়

ঈশ্বরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ অর্পণ করিলাম। যে পিতার শরণাপন্ন হয়, কেহই তাহাকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। মাতা ঠাকুরাণী ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু অগ্রজ মহাশয় হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। প্রধান প্রধান গোস্বামীগণ আমাকে বলিলেন যে, "তুমি শান্তিপুর ত্যাগ কর, নতুবা তোমার দৃষ্টান্তে অনেকের অনিষ্ট হইবে।" আমি বলিলাম যে আপনাদের আশীর্ব্বাদে যদি শান্তিপুরে বাস করিয়া ইহার কিছু উপকার করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন সফল হয়। আমার বিশ্বাস যে, হয়ত কালেতে এই ঠাকুরঘর ব্রাহ্মসমাজ হইতে পারে। এই কথা শুনিয়া আমাকে সমাজচ্যুত করিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন। সেই বারেই শান্তিপুরে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইল। কুসংস্কারাপন্ন শান্তিপুরে ব্রহ্মোপাসনা হইল ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে? ব্রাহ্মদিগের জীবনে ব্রহ্মোপাসনা ও সত্য পালনে দৃঢ়তা থাকিলে শান্তিপুরের বিশেষ উপকার হইত। ব্রাহ্মদিগের স্ব স্ব জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না থাকাতে ব্রাহ্মসমাজে অনেকের অশ্রদ্ধা হইল। বিশুদ্ধ জীবনই ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান অবলম্বন।

আত্মীয় বন্ধু সকলেই পরিত্যাগ করিলেন, কেবল আমার ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয়[৩] আমাকে ত্যাগ করিলেন না। তিনি ত্যাগ করিলেন না বলিয়া আমার ভগ্নী শান্তিপুরের বাটীতে স্থান পাইলেন না। অগত্যা মৈত্র মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে বাসায় (পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে) আনিলে আমাদের বাসায় প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা হইতে লাগিল। এক মাসের পর আমার পূজনীয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বলিলেন যে, পৌত্তলিক উপাসনা অপেক্ষা ব্রহ্মোপাসনাই তাঁহার ভাল বোধ হয়। তিনি ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে যেমন আহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, এখনও তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসনা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ক্রমে উপাসনার প্রতি তাঁহার গাঢ় অনুরাগ হইল। এখন হইতে ভাই ভগ্নীতে পিতার চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলাম। মৈত্র মহাশয় যেরূপে সাংসারিক কষ্টে পড়িয়াছিলেন, উপাসনার গাঢ় অনুরাগ না হইলে সপরিবারে কখনই সেই কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন না। ধর্ম্মের জন্য মনুষ্য কত দুঃখ সহ্য করিতে

৩। ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন মহাশয়ের মাতামহ ও রাজলক্ষ্মী দেবীর পিতা।

পারে তাহা তাঁহাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পাঁচটী সন্তান লইয়া সেই কষ্ট বহন করা বাস্তবিকই অসম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। পৌত্তলিক মতে মৈত্র মহাশয় পুত্রের বিবাহ দিলে সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন। সত্যের অনুরোধে তৃণবৎ সে অর্থ পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মরাজ্যের ইহা অতি রমণীয় দৃশ্য। ইঁহাদের কষ্ট দেখিয়া আমার নিজের যন্ত্রণা যৎসামান্য বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল।

একদিন (১৮৬২ খৃঃ) সঙ্গতে শ্রবণ করিলাম যে, বাগ্‌আঁচড়া নামক স্থানে অনেকগুলি লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে; কে সেখানে যাইবে এমন লোক পাওয়া যাইতেছে না। তখনই সেখানে যাইবার জন্য স্বীকৃত হইলাম। কেহ কেহ বলিলেন যে, মেডিকেল কালেজে উত্তীর্ণ হইবার আর অল্প সময় আছে, এখন অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিলে কিরূপে উঁহার পরিবার প্রতিপালিত হইবে। যিনি মরুভূমিতে তৃণ গুল্ম রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর নীর মধ্যে প্রাণীপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, কোন্ অবিশ্বাসী বলিবে যে, তিনি অনাহারে দুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন? ভক্তিভাজন কেশববাবু বলিলেন যে, প্রচারক হইলে পরীক্ষা দিতে হইবে। আমি তাহাতেও সম্মত হইলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। (১৭৮৫ শক ভাদ্রমাস) প্রথমে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে অধ্যেতার কার্য্য এবং কোন্নগর, লেবুতলা, পটলডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতিতে উপাসনার কার্য্য করিতাম। সর্ব্বত্রই বিনা আপত্তিতে কার্য্য হইত, কেবল শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ সংস্কৃত ভাষাতে উপাসনা করিতে অসম্মত হইয়া গোলযোগ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম মতভেদ দর্শন করিলাম। কিন্তু এই সামান্য মতভেদে ভ্রাতৃভাবের কিছুমাত্র অভাব বোধ হয় নাই। এখন যেমন অল্প মতভেদ হইলেই ভ্রাতৃভাব তিরোহিত হয়, ভ্রাতা ভ্রাতার দোষ ঘোষণা করিতে ক্ষিপ্রহস্ত হন, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না।

কথিত বাগ্‌আঁচড়ায় (১১ই পৌষ) গমন করিয়া দেখিলাম তত্রত্য লোকদিগের কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হইবার জন্য যত আগ্রহ, ধর্ম্মগ্রহণের জন্য তত নহে। যে জন্যই হউক, অনেকগুলি লোকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থায়ী হইবে না, একারণে সেখানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলাম, কিন্তু অর্থাভাবে বিদ্যালয়টী স্থায়ী হইল না। জ্ঞানের চর্চ্চা না হওয়াতে বাগ্‌আঁচড়ার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। ধর্ম্মে গাঢ় অনুরাগ

থাকিলে ঘোর মূর্খও ধর্ম্মপথে স্থির থাকিতে পারে, নতুবা মূর্খতা দ্বারা ধর্ম্মের বিশেষ হানি হয়। মহাত্মা চৈতন্যের বিশুদ্ধ ভক্তিময় ধর্ম্ম, অধিকাংশ মূর্খ লোকের হস্তে পড়িয়া কলঙ্কিত হইয়া গেল। বাগ্‌আঁচড়ার অবস্থাও প্রায় সেইরূপই হইতেছে। কতকগুলি লোক ব্যভিচারকে ধর্ম্মের নামে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। অনেকেই প্রতিদিন উপাসনা করে না, অথচ দেবদেবীর পূজাতে উৎসাহ দিয়া থাকে। জ্ঞান চর্চ্চা ভিন্ন এই সকল অভদ্র ব্যবহার হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়? প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতেন, তাহা হইলে এই দুঃখী লোকদিগের বিশেষ উপকার হইত। দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন দান না করিলে, মাহামারীতে পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ পথ্য প্রদান না করিলে লোকে নিষ্ঠুরতা বলে, কিন্তু জ্ঞানহীন মূর্খদিগের আন্তরিক দুর্দ্দশা, ধর্ম্মহীন পাপদগ্ধ মনুষ্যের হৃদয়-যন্ত্রণা দূরীভূত না করিলে কেহই নিষ্ঠুরতা মনে করে না। দুঃখ দূর করাই যদি দয়ার কার্য্য হয়, তবে পাপযন্ত্রণা দূর করা অপেক্ষা পৃথিবীতে দয়ার কার্য্য আর কিছুই নাই। যাহারা কখনও পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহারাই জানে অন্ন দান অপেক্ষা স্বর্গীয় উপদেশের মূল্য কত অধিক। যে পাপের যন্ত্রণা ভোগ করে সেই ব্যক্তিই পাপদগ্ধ মনুষ্যের জন্য অশ্রুপাত করে। বাগ্‌-আঁচড়ার শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিলে ক্রন্দন না করিয়া থাকা যায় না। একজন বিশুদ্ধজীবন ব্রাহ্ম বিদ্যালয় করিয়া সেখানে অবস্থিতি করিলে বিশেষ উপকার হয়। বাগ্‌আঁচড়ায় একজন ব্রাহ্ম আমাকে বলিলেন যে, "যদি উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ তবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বেদান্তবাগীশ মহাশয়, বেচারামবাবু ইঁহারা উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া বেদীর কার্য্য করেন কেন? তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকে উপবীত রাখা উচিত মনে করিবে।" এই সরল ব্রাহ্মভ্রাতার কথা শ্রবণ করিয়া আমি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, ব্রাহ্মসমাজে এমন অসত্য ব্যবহার থাকা উচিত নহে। যদি ব্রাহ্মসমাজের এই কুরীতি সংশোধিত না হয়, তবে যে সমাজ অসত্যে প্রশ্রয় দেয় তাহার সহিত যোগ দিব না। তাহাতে সম্পাদক ও আচার্য্য ভক্তি-ভাজন কেশববাবুর নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন পত্র লিখিয়াছিলাম যে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সমুদায় সমাজের আদর্শ, ইহাতে কোন অসত্য ব্যবহার থাকিলে তাহা সমস্ত সমাজে পরিগৃহীত হইবে। তখন আদি সমাজকে

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বলা হইত। অতএব কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যগণ যদি উপবীতধারী হয়, তবে আমি সমাজকে অসত্যের আলয় বলিয়া পরিত্যাগ করিব। কেশববাবু এই আবেদন পত্র দেবেন্দ্রবাবুকে প্রদান করেন। দেবেন্দ্রবাবু তখন উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। (৮পৃঃ) এজন্য তিনিও এই আবেদনে অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবু কোন ক্রমেই উপবীত ত্যাগ করিবেন না। অতএব দুইজন উপবীতত্যাগী উপাচার্য্য পাইলেই তাঁহারাই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হইবেন। ইহা শুনিয়া আসিয়া কেশববাবু আমাকে এবং অন্নদাবাবুকে উপাচার্য্য হইতে অনুরোধ করিলেন। এ সময়ে ব্রাহ্মদের মধ্যে তিন চারি জন উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, এজন্য আমি উপাচার্য্য হইতে অসম্মত হইলাম। কেশববাবু বলিলেন যে, তুমি সম্মত না হইলে এই কার্য্যটী সম্পন্ন হইবে না। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে সম্মত হইলাম। পরে বিশেষ দিন ধার্য্য করিয়া অন্নদাবাবু, পাক্ড়াশী মহাশয় এবং আমি উপাচার্য্য হইব বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। পাকৃড়াশী মহাশয় দেবেন্দ্রবাবুর নিকট ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি উপবীত ত্যাগ করেন নাই। এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া পাকৃড়াশী মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। যে তত্ত্ববোধিনীতে পাক্ড়াশী মহাশয়ের নাম ছিল, তাহা দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পত্রিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা হইল। কিন্তু পাকৃড়াশী মহাশয় উপাচার্য্য না হওয়াতে সকলেই দুঃখিত হইলেন, কারণ পাকৃড়াশী মহাশয়ের সাধু ব্যবহারে তৎকালে সকলেরই মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে দেবেন্দ্রবাবু নির্দ্দিষ্ট দিবসে আমাদিগকে উপাচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেইদিন অবধি আমি আর অন্নদাবাবু উপাচার্য্যের কার্য্য করিতে লাগিলাম।

একদিন দুই প্রহর বেলায় ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তলে বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি গরদের বস্ত্র, অঙ্গুরী ও একখানি পত্র লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল। পত্রখানি দেবেন্দ্রবাবুর হস্তাক্ষরে লিখিত, কিন্তু তাঁহার বৈবাহিকের স্বাক্ষরিত। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল যে, অদ্য সায়ংকালে আমার পৌত্রের নামকরণ হইবে। আপনি উপাচার্য্যের কার্য্য করিবেন এবং প্রেরিত বস্তু সকল গ্রহণ করিবেন।

বরণের দ্রব্যগুলি দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা হইতে লাগিল। মনে করিলাম এই সকল ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে

পৌরোহিত্য প্রথা প্রচলিত হইবে সন্দেহ নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া বরণের দ্রব্যগুলি প্রতিপ্রেরণ করিলাম। আমি বরণ গ্রহণ করিলাম না বলিয়া দেবেন্দ্রবাবু প্রভৃতি সকলেই আমার প্রতি বিরক্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম বিরক্তির ভাব দর্শন করিলাম। তজ্জন্য আমার মনে এত দুঃখ হইয়াছিল যে, দেবেন্দ্রবাবুর নিকট ক্রন্দন না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না।

একদিন দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, আমি তোমাকে যেখানে যাইতে বলিব সেখানে যাইতে হইবে। সেই কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। যে জীবন ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়াছি, সে জীবনে কিরূপে মনুষ্যের দাসত্ব করিব? আমি দেবেন্দ্রবাবুকে বলিলাম "ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া প্রচার ক্ষেত্রে গমন না করিলে জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। স্বাধীনভাবে প্রচার করিতে দিন প্রচারের মধ্যে যেন সংসারের প্রভুত্ব প্রবেশ না করে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্রবাবু লজ্জিত হইয়া বলিলেন যে, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সকল স্থানে গমন করিতে পারি না। এজন্য যেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা হয় সেখানে যদি তুমি গমন কর, তাহা হইলে আমার মনে বিশেষ আনন্দ হয়।" পরে বলিলেন যে, "স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার কর; বীজ বপন কর, ঈশ্বরের কৃপাতে সুফল উৎপন্ন হইবে। ফলের জন্য চিন্তা করিও না, ফলদাতা ঈশ্বর তিনি তোমার সহায় থাকুন।"

এইরূপ দুই এক বিষয়ে দেবেন্দ্রবাবুর মতে যোগ দিতে না পারিয়া মনে করিলাম, যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করি তখন কাহারও নিকট পরিচিত ছিলাম না, একাকীই সংসারে বিচরণ করিতাম। কাহারও মতের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইত না। কিন্তু যতই অনেকের নিকট পরিচিত হইতেছি, ততই মতভেদের আশঙ্কায় ভীত হইতেছি। সকলেই যদি ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিয়া জীবন পথে বিচরণ করেন, তাহা হইলে কোন গোলযোগ হয় না। মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আপনার মত জগতে প্রচার করিতে গেলেই পরস্পরের মতের সহিত বাদানুবাদ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্ম মনে করিলেন যে, কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজের ভার লইয়া যেরূপ কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতে পৌত্তলিক সমাজে মহা গোলযোগ হইবে। সপ্তাহান্তে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিলেই হইল; পৌত্তলিকতা

ছাড়িবার জন্য এত ব্যস্ত কেন ? সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে অনেক ব্রাহ্ম অগ্রসর হইতে ভীত হইয়া দেবেন্দ্রবাবুর নিকট যাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, "কেশববাবুর হস্তে ব্রাহ্মসমাজের ভার দেওয়াতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি যেরূপ হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর কিছুদিন তাঁহার হস্তে ব্রাহ্মসমাজের ভার থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ লোকশূন্য হইবে, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। এখনও যদি আপনি ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে চান, তবে শীঘ্র কেশববাবুর নিকট হইতে ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করুন। বিশেষতঃ বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবুকে উপাচার্য্য হইতে না দেওয়াতে তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হইয়াছে। আপনি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে উপাচার্য্য করুন।"

দেবেন্দ্রবাবুর একটী বিশেষ স্বভাব এই যে, কোন কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেই তিনি তাহাতে বিশ্বাস করেন। কতকগুলি বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্রাহ্ম পুনঃ পুনঃ দেবেন্দ্রবাবুকে উত্তেজনা করাতে তিনি মনে করিলেন যে, যখন ইহারা এত আগ্রহের সহিত বলিতেছেন তখন ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। ইহার কিছু পূর্ব্বে কতকগুলি বিখ্যাত ব্রাহ্ম কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া বহুবাজারে একটী ব্রহ্মোপাসনালয় সংস্থাপন করেন। তাঁহারা সংস্কৃত উপাসনা পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় নূতন উপাসনা পদ্ধতি মতে উপাসনা করিতে লাগিলেন। ইহারা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, দেবেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মসমাজের যে কোন কার্য্য করেন, তাহাতে কাহারও মত গ্রহণ করেন না। তিনি কাহারও মত না লইয়া আপনা আপনি উচ্চপদ গ্রহণ করেন, সমাজকে সাধারণের সম্পত্তি মনে না করিয়া আপনার সম্পত্তি জ্ঞানে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। কেহ তাঁহার অনুগত না থাকিলে তাহাকে অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণা করেন। বিশেষতঃ সংস্কৃততে উপাসনা করা আমাদের মত নয়, এজন্য পৃথক্ সমাজ করিয়াছি। দেবেন্দ্রবাবু মনে করিলেন যে, কেশববাবুর প্রতি বিরক্ত হইয়াই ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতেছেন। এইরূপে পরস্পরের মনে সংশয় উপস্থিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেরূপ অন্তরে বাহিরে সরলভাবে আলাপ হইত, এখন তাহার কিছু বিপর্য্যয় ঘটিল। অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, কয়েকজন ব্রাহ্মের স্বার্থপরতা হইতেই ব্রাহ্মসমাজে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মগণ যদি আত্মার সদ্গতির জন্য—পরিত্রাণের জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে সহস্র মতভেদেও বিবাদ হইতে পারে না।

গোপনে গোপনে এইরূপ আলোচনা হইতেছে, ইহার মধ্যে ২০এ আশ্বিনের (১৮৬৪ খৃঃ) প্রবল বাত্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতা নগরে মহাপ্রলয় ঘটিল। প্রকাশ্য পথে বর্ষাকালের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। পথের উভয় পার্শ্বে গৃহ সকল ভগ্ন হইতেছে, আহত ব্যক্তিদিগের ক্রন্দন ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কার সাধ্য গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারে? সে দিবস বুধবার, এ জন্য যতই বেলা অবসান হইতে লাগিল, ততই সমাজে যাইবার জন্য মনের ব্যস্ততা বৃদ্ধি হইল। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে আর থাকিতে পারিলাম না। বন্ধু বান্ধব সকলেই বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমাজে যাইবার জন্য মন এত ব্যাকুল হইল যে আর কালবিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলাম। সমস্ত পথে প্রায় সন্তরণ দিয়া যাইতে হইয়াছিল। সমাজে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, আর কেহই উপস্থিত হন নাই। আমি নিয়মিতরূপে উপাসনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি, পথিমধ্যে কেশববাবুর সহিত দেখা হইল—তিনিও ব্রাহ্মসমাজে গমন করিতেছেন। পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলাম। সে দিন ব্রাহ্মসমাজের গম্ভীরভাবে পরলোকের গম্ভীরতা উপলব্ধ হইয়াছিল। পরে দুই জনেই গৃহে চলিয়া আসিলাম। এই বাত্যাতে ব্রাহ্মসমাজ গৃহটী ভগ্নপ্রায় হয়, এ জন্য সেখানে আর উপাসনা না হইয়া যত দিন সমাজ গৃহ পুনঃ সংস্কৃত না হইবে ততদিন দেবেন্দ্রবাবুর বাটীতে উপাসনা কার্য্য হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রদান করা হইল। বাত্যার দিনের পর বুধবার অপরাহ্নে দেবেন্দ্রবাবু আমাকে বলিলেন যে, অন্নদাবাবু পীড়িত আছেন, আসিতে পারিবেন না, অতএব তুমি ও পাকড়াশী মহাশয় অদ্য বেদীর কার্য্য কর। এই মর্ম্মে কেশববাবুকেও একখানি পত্র লিখিলেন। কেশব বাবু উত্তর দিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র বেদীকে পৌত্তলিকতার চিহ্ন দ্বারা আর অপবিত্র করা উচিত নহে। আমি দেখিলাম যে, দেবেন্দ্রবাবু কতকগুলি পৌত্তলিক ব্রাহ্মের পরামর্শে পুনর্ব্বার উপবীতধারী ব্রাহ্মকে উপাচার্য্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা নষ্ট করিতেছেন। সুতরাং আমি ব্রাহ্মসমাজে গমন না করিয়া একটী বন্ধুর বাটীতে উপাসনা করিলাম। কারণ আমি ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রবাবু পাকড়াশী মহাশয়দ্বারা উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের এই সকল কার্য্য দেখিয়া কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের

কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেশববাবু পৃথক্‌রূপে প্রচার বিভাগ সংস্থাপন করিলেন।[৪] এই সময়েই ব্রাহ্মসমাজে দুইটী দল হইল এবং পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ প্রবেশ করিল; বিদ্বেষের কি আশ্চর্য্য শক্তি! দুই দিবস পূর্ব্বে যাঁহাকে প্রাণের বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি, তিনিই এখন প্রধান শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংসারের অর্থসম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়, এখানে তাহা নহে, শুদ্ধ মতভেদই বিবাদের মূল। এক মতভেদে এতদূর বিবাদ হইতে পারে, তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। মতভেদের মধ্যে স্বার্থপরতা না থাকিলে বোধ হয় এত অমঙ্গল হইত না।

যাঁহারা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে অসত্যের প্রশ্রয় দিতে দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন যে যাহাতে চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র সত্য প্রচার হইতে পারে, প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া দেখিলাম, অধিকাংশ সমাজে ব্রাহ্মগণ কেবল সপ্তাহান্তে উপাসনা করেন, প্রতিদিন উপাসনা করেন না, এবং পৌত্তলিকতার সহিত তাঁহাদের সম্পূর্ণ যোগ। এমন কি আমি উপবীতত্যাগী বলিয়া অনেক স্থানের ব্রাহ্মগণ আমাকে বাসায় স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। কেহ কেহ বাসায় স্থান দিয়া সমাজচ্যুত হইলেন। ব্রাহ্মগণ যাহাতে প্রতিদিন উপাসনা করেন এবং পৌত্তলিকতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, সকল স্থানে এই বিষয়েরই আলোচনা করিতাম। কিন্তু সকল স্থানে বিশেষ ফল লক্ষিত হইল না। ঢাকাতে কতকগুলি ব্রাহ্ম প্রকাশ্যরূপে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাদিগকে নির্যাতন করিবার জন্য ঢাকার হিন্দুগণ হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপন করিয়া বিশেষ উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। আবার কতিপয় অধিক বয়স্ক ব্রাহ্ম পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় মত সমর্থনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিকতাত্যাগী ব্রাহ্মগণ একটী সঙ্গত সভা সংস্থাপন করিয়া বিশেষরূপে ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে (১৭৮৭ শক) পূর্ব্ব বাঙ্গলায় বিশেষ আন্দোলন। সঙ্গতস্থ ব্রাহ্মদিগের দিন দিনই ধর্ম্মোন্নতি হইতে লাগিল।

৪। Indian Mirror ১লা আগষ্ট ১৮৬১ খৃঃ হইতে চলিতেছিল। ১৭৮৬ শক কার্ত্তিক মাস হইতে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং ইঁহারা স্বাধীনভাবে মতামত প্রচার করিতে থাকেন।

তাঁহাদের মধ্যে কয়েক ভক্তের স্বর্গীয় প্রেম ভক্তি সকলেরই অনুকরণীয়। তাঁহাদের ভক্তি প্রেমে আমার পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি চিরদিন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে পৌত্তলিকতার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ঢাকার ব্রাহ্মগণ যেরূপ ঈশ্বর লাভের জন্য পৌত্তলিকতার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি প্রেমে বিগলিত হইয়াছিলেন, বরিশালের ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের সেরূপ ভাব লক্ষিত হইল না। তাঁহারা কর্ত্তব্যের অনুরোধে সভ্যতা বৃদ্ধির জন্য পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেন না। কেহ কেহ আমোদে পড়িয়া সভ্যতা স্রোতে ভাসমান হইয়াছিলেন। যাঁহাদিগের মন ঈশ্বর প্রেমে বিগলিত হইয়াছিল, তাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক প্রতিদিন পরব্রহ্মের পূজা করিয়া হৃদয় মন পবিত্র করিতেন। যাঁহারা আমোদে পড়িয়া যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা অধিক দিন স্থির থাকিতে না পারিয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলেন। যে বরিশাল একদিন পূর্ব্ববাঙ্গালার আদর্শ হইয়াছিল, এখন সেই বরিশালে ধর্ম্মভাবের অবনতি ও ব্রাহ্মসমাজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া না কান্দিয়া থাকা যায় না। পরিত্রাণার্থী হইয়া ধর্ম্ম পথে অগ্রসর না হইলে নিশ্চয়ই পতন হয় সন্দেহ নাই। মনুষ্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও সভ্যতার আলোকে উজ্জল হইতে পারে, কিন্তু সে সভ্যতা দ্বারা হৃদয় পবিত্র হয় না। যদ্দ্বারা হৃদয় মন পবিত্র হয়, প্রশস্ত হয়, জনসমাজের পাপতাপ দূরীভূত হইয়া প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হয় তাহাই প্রকৃত সভ্যতা। কোন দেশ বিশেষের আচরণকে সভ্যতা বলিয়া গণ্য করা যায় না। কারণ মনুষ্যের রুচির ভিন্নতা প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশে সভ্যতার লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন। ব্রাহ্মগণ কেবল ঈশ্বর লাভের জন্যই ব্যাকুল থাকিবেন, যাহা ঈশ্বর লাভে অনুকূল তাহাই তাঁহাদিগের একমাত্র কার্য্য, যাহা ঈশ্বর লাভে প্রতিকূল তাহা তাঁহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন। পৌত্তলিকতা ও পৌত্তলিকতার কোন প্রকার সংশ্রব ঈশ্বর লাভে প্রতিকূল, এই জন্যই ব্রাহ্মগণ অস্থির হইয়া পৌত্তলিকতার সংশ্রব হইতে দূরে যাইয়া দয়াময়ের অভয় পদ আশ্রয় করেন। আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি পরিত্রাণার্থী হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ না করিলে কেহই চিরদিন স্থির ভাবে ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারিবে না, ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেহ পৌত্তলিক, কেহ নাস্তিক হইবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বরিশালে প্রথমে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা লাভের সূত্রপাত দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। যে সকল ভগ্নী স্বাধীনতা লাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, প্রথম হইতেই তাঁহাদিগকে বলিয়া আসিতেছি যে, ভগ্নীগণ! ঈশ্বরের অধীন হওয়া—ধর্ম্মের অধীন হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা। ঈশ্বরের অধীন হইয়া তাঁহার আদেশ পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। তাঁহার আদেশ পালন করিতে গিয়া যদি পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্র, কন্যা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, শরীর পর্য্যন্ত বলিদান দিতে হয় তাহাতেও পরাঙ্‌মুখ হইও না। সমাজভয়ে সত্যপালনে বিরত থাকাই প্রকৃত অধীনতা। আন্তরিক রিপুদিগকে বশীভূত করিয়া পবিত্র থাকাই যথার্থ স্বাধীনতা। রিপুদিগের অধীন হইয়া পাপের দাস হওয়াই প্রকৃত পরাধীনতা। পুরুষের সহিত প্রকাশ্যভাবে আলাপ করা, প্রকাশ্য পথে পদব্রজে অথবা অনাবৃত যানে বিচরণ করা, পুরুষদিগের সভায় উপস্থিত হইয়া স্বাধীনতা প্রদর্শন করা ইহার একটীকেও স্বাধীনতার লক্ষণ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আমাদের দেশের নীচশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করে, সর্ব্বদা পুরুষ মণ্ডলীতে অবস্থিতি করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে স্বাধীন বলা যায় না। তাহারা সম্পূর্ণরূপে রিপুর অধীন, অথচ প্রচলিত দেশাচারকে অসত্য জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। বরিশালের ভগ্নীগণ এই সকল কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদেরই দুই এক জনের সৎসাহসে তাঁহাদের স্ব স্ব স্বামী ধর্ম্মপথে অবিচলিত আছেন। প্রকৃত স্বাধীনতার সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর না হইয়া, সভ্যতার গর্ব্বে আপনাকে উন্নত বলিয়া বিশ্বাস করিলে মন অহঙ্কৃত হয়, ধর্ম্মোন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হয়। ইহা স্মরণ রাখিয়া সকলেরই সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব বাঙ্গালার ব্রাহ্মগণ যতই ব্রাহ্মধর্ম্মে দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, হিন্দু সমাজ ততই তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। অনেক ব্রাহ্ম পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। আবার অনেকগুলি দুর্ব্বল ব্রাহ্ম অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া হিন্দুসমাজের শাসনানুসারে মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ অন্যায় বলিয়া আপনাপন আন্তরিক স্বার্থপরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সকল দুর্ব্বল ভ্রাতার জন্য নির্জ্জনে কত অশ্রুপাত করিয়াছি, তাহা সেই অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু তাঁহারা গালি দিয়া পদাঘাত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা পূর্ব্বে আমার নাম শুনিয়া কত আনন্দ

প্রকাশ করিতেন, এখন সেই সকল হৃদয়বন্ধু ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কঠোররূপে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। আমার জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক, কি নাস্তিক হইতে সংকল্প করেন, তাঁহারাই প্রথমে প্রচারকের দোষ অনুসন্ধান করিয়া লোকের নিকট তাঁহাকে অপদস্থ করিতে যত্নবান্ হন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইলে দেবতা হওয়া যায় না, সকল মনুষ্যের হৃদয় যেমন দোষ গুণে সমন্বিত, প্রচারকের হৃদয়ও তদ্রূপ। এমন অনেক ব্রাহ্ম আছেন যাঁহারা প্রচারক অপেক্ষা অনেক পরিমাণে ধর্ম্মভাবে সমুন্নত। যাঁহারা প্রচারককে দোষশূন্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত সন্দেহ নাই! ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগের সময় প্রচারকের প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষ হয় কেন? প্রচারক সর্ব্বদাই সরলভাবে সত্য পালন করিতে বিশেষরূপে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাতে দুর্ব্বল হৃদয় বাস্তবিকই আঘাত প্রাপ্ত হয় ও ব্যথিত হয়। তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করিলে একখানি পৃথক পুস্তক লিখিতে হয়, এজন্য এ বিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক যে, প্রচার বিভাগ পৃথকরূপে সংস্থাপিত হইলে, কতিপয় ব্রাহ্ম ভ্রাতা বিষয়কর্ম্মের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, সাংসারিক সুখ দুঃখের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, অভয়দাতা ঈশ্বরের চরণে সম্পূর্ণ শরণাপন্ন হইয়া প্রচারকের অনন্তব্রত গ্রহণ করিলেন। যে ব্রত অবলম্বন করিলে প্রাণান্তেও আর পরিত্যাগ করা যায় না, এই দেবপ্রকৃতি মহাত্মাগণ সেই প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যত্নে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইল। তাঁহাদিগের পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদের প্রেমপূর্ণ মুখশ্রী, স্বর্গীয় উৎসাহ, সাধারণ মনুষ্যের প্রতি আন্তরিক দয়া, পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃপ্রণয়, উপাসনার প্রগাঢ়ভাব এসকল দর্শন করিয়া নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছিল। এই সময়ের কিছুকাল পরেই (১১ নবেম্বর, ১৮৬৬ খৃঃ) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ব্রাহ্ম ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া সভ্য হইলেন। কলিকাতা নগরে একটী উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্ন হইতে লাগিল। এখন প্রচারকগণ সাংসারিক দুঃখকে বিশেষরূপে বহন করিতে প্রস্তুত

হইলেন। একে সমস্তদিন অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধানলে দগ্ধ, তাহার উপর আবার পরিবারদিগের ভৎর্সনা, প্রচারকগণ ব্রতপালন জন্য সকল প্রকার কষ্টই বহন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পরিবারবর্গ কষ্ট সহ্য করিতে কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না, বরং তাঁহাদিগকে অন্যায়রূপে কষ্ট দেওয়া হইতেছে, এ জন্য দুবেলা অভিসম্পাত করিতেন। পরিবারদিগের এই ভয়ানক গঞ্জনাই প্রচারকদিগের বৈরাগ্য শিক্ষার ও সহিষ্ণুতা অভ্যাসের বিশেষ অবলম্বন ছিল। এই সময়ে তাঁহাদিগের অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব, ইণ্ডিয়ান মিরার লেখা এবং কলিকাতা কালেজে (১৮৬২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত) শিক্ষকতার কার্য্য ছিল। প্রকাশ্যে একত্র উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। কেবল ব্রাহ্মিকাসমাজের (১৮৬৫ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত) কার্য্য স্থানবিশেষে নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহিত হইত। তখন ব্রাহ্মের স্ত্রী হইলেই ব্যাকরণ অনুসারে ব্রাহ্মিকা নাম প্রাপ্ত হইতেন, নতুবা দুই চারিজন ভিন্ন অধিকাংশ ব্রাহ্মিকাই পৌত্তলিক ধর্ম্মে আস্থান্বিতা ছিলেন—কেবল স্ব স্ব স্বামীর অনুরোধে ব্রাহ্মিকা সমাজে উপস্থিত হইতেন।

এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠান লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতে লাগিল। বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে এই সকল কার্য্য যতই হইতে লাগিল, ততই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। দুর্ব্বল ব্রাহ্মগণ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহার মধ্যে কেশববাবু "যিশুখৃষ্ট—ইয়োরোপ ও আসিয়া," এবং "গ্রেট্‌ম্যান্‌" এই দুইটী বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতাদ্বয়ের গূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ কেশববাবুকে খৃষ্টান বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অসদ্ভাব এতদূর প্রবল হইয়া উঠিল যে তাঁহারা মিথ্যা কথা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া কেশববাবু খৃষ্টান হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুজ্ঝটিকা যেমন সূর্য্যের আলোক আবরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ অসত্য সত্যকে আবরণ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। তাঁহারা যতই মিথ্যা চেষ্টা করিলেন, লোকে ততই তাঁহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিল। মনুষ্য বিদ্বেষ পরবশ হইলে কোন দুষ্কর্ম্মই তাহার অকৃত থাকে না। ধর্ম্ম লইয়া পরস্পর যেমন অকৃত্রিম প্রণয় হইয়া থাকে, ধর্ম্মের নামে তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণে বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের পিতা হইয়া পুত্রের প্রতি যে সকল

দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কে না অবগত আছেন? রোমান্ ক্যাথলিক্ খৃষ্টানেরা প্রটেষ্টাণ্টদিগের প্রতি যেরূপ রোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহা শুনিতে হৃৎকম্প হয়। যদি ইংরাজ রাজ্যের প্রবল শাসন না থাকিত, তবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ কেবল গালি দিয়া যে নিরস্ত হইতেন এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক ব্রাহ্মসমাজের এই দৃশ্য অত্যন্ত শোচনীয়। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া কে বলিতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ শান্তিনিকেতন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা সমস্ত নরনারী এক পরিবার হইবে? বাস্তবিক যাহা ব্রাহ্মসমাজ তাহা শান্তিনিকেতন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয়ই সমস্ত নরনারী এক পরিবার হইবে। কিন্তু কৃত্রিম ব্রাহ্মধর্ম্ম, কপট ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা সে আশা কখনই পরিপূর্ণ হইবে না, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সময়ে কিছুদিনের জন্য শান্তিপুরে গমন করিলাম। ব্রাহ্মসমাজের গোলযোগে আমার মন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, অন্তরে সহিষ্ণুতা ছিল না, সদ্ভাব ছিল না, হৃদয় জিগীষাপরবশ হইয়া সর্ব্বদাই উত্যক্ত থাকিত। দীর্ঘকাল উপাসনা করিতে সক্ষম হইতাম না। এই সকল কারণে অশান্তিতে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বসন্তকালে শান্তিপুরের গঙ্গার চড়ার শোভা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী। রজতময় বালুকারাশির উপর চন্দ্রমার শুভ্র জ্যোতিঃ নিপতিত হইলে কি আশ্চর্য্য শোভা হয় তাহা না দেখিলে অনুভব করা যায় না। উপরে ঐ অপূর্ব্ব শোভা নীচে আবার নির্ম্মলসলিলা গঙ্গানদী ধীরবেগে মৃদু মৃদু কল্লোল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছে। সেই নির্ম্মল তরঙ্গমালায় চন্দ্রমা শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলচর পক্ষীগণের মধুর সঙ্গীতে সন্তাপিত হৃদয় শীতল না হইয়া থাকিতে পারে না। মস্তকের উপরে নীলনভস্তলে তারকাবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মনোহারিণী শোভা। আমি প্রতিদিন শোভা সম্ভোগ করিতে গিয়া নির্জ্জনে চিন্তা করিতাম, যে, হায়! দয়াময় ঈশ্বর যে হস্তে এই সমস্ত শোভার ভাণ্ডার প্রকৃতিপুঞ্জকে সৃজন করিয়াছেন, এই নরাধমকেও সেই হস্তে সৃজন করিয়াছেন, সৃষ্টিকাল অবধি প্রকৃতির শোভা একই ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু আমার হৃদয়ের শোভা কে হরণ করিল? দিন দিন যতই এই শোভা দেখিতে লাগিলাম, ততই হৃদয় ব্যাকুল হইতে লাগিল, প্রাণ অস্থির হইল আর কিছুই ভাল লাগে না। এই অসহ্য দুঃখের সময় শান্তিপুর নিবাসী ভগবদ্ভক্ত ৺হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়কে আমার দুর্দ্দশার কথা বলি। তিনি দয়া

করিয়া আমাকে "চৈতন্য চরিতামৃত" পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। হরিবাবু পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি শান্তিপুরে জুতা পায়ে দিতেন না। এমন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব হইলেও তাঁহার সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল না। তিনি বলিতেন, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব, অতএব প্রভু! আমিও ব্রহ্মজ্ঞানী। এইরূপ মধুর কোমল বাক্যে তিনি আমার দগ্ধ হৃদয়ে প্রেমবারি সিঞ্চনে আমাকে সুশীতল করিতেন। ভক্তিভাজন মহাত্মা হরিমোহন প্রামানিক আমার ধর্ম্মজীবনে একজন গুরু। আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। চৈতন্য চরিতামৃত নামক বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ আমার হস্তগত হইল। এই পুস্তকখানি প্রথমে কিছু কঠোর বোধ হইয়াছিল, পরে যতই পাঠ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, ততই অমৃত খনি আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। মহাত্মা চৈতন্যের বিনয়, ভক্তি, অনুরাগ, ব্যাকুলতা, ঈশ্বর দর্শন ও সম্ভোগ এবং উন্নতাত্মা পাঠ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার জীবনের সম্পূর্ণ হীনতা অনুভব করিলাম। আহা! এস্থলে মহাত্মা চৈতন্যকে গুরু বলিয়া ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইল, ঈশ্বর দর্শন ও সাধনের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থ হইলাম। "জীবে দয়া নামে ভক্তি" ইহার তত্ত্ব হৃদয়ে প্রবেশ করিল। বাহিরের ধর্ম্মানুষ্ঠান যে পরলোকের সম্বল নহে, কেবল দয়াময়ের অভয় চরণই সম্বল, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইল। তখন অসহনীয় অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। হায়! আমি এতদিন কি করিলাম? জীবনের একদিনও সাধন করি নাই, আমার গতি কি হইবে? এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সাধন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলাম। কিন্তু কিরূপে সাধন করিতে হয়, তাহা জানি না, কেবল প্রেমভক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিতাম। এই সময় বন্ধুবর নীলকমল দেব মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে গমন করি। নবদ্বীপে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া কিরূপে ভক্তি হয় জিজ্ঞাসা করি। "ভক্তি" এই কথা আমার দগ্ধ মুখ হইতে বাহির হওয়াতে চৈতন্যদাস বাবাজীর এতদূর প্রেমোচ্ছ্বাস হইল যে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত, এমন কি মস্তকের টিকি পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিল। তিনি দয়া করিয়া উপদেশ দিলেন যে, "যদি প্রেমভক্তি লাভ করিতে চাও, তবে দীন হীন অকিঞ্চন হও। অন্তরে একবিন্দু অহঙ্কার থাকিলেও ভক্তিলাভ হইবে না। জলস্রোত যেমন উর্দ্ধগামী হয় না, ভক্তিও তদ্রূপ অহঙ্কৃত মনে উদিত হয়

না।” সেই প্রেমিক মহানুভব চৈতন্যদাসের উপদেশ শিরোধার্য্য করিলাম। মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। কারণ আমার স্বভাব অত্যন্ত উদ্ধত, অসহিষ্ণু—বলিতে কি আমার ন্যায় ক্রোধী লোক জগতে অল্পই আছে। এই পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া ভূমিসাৎ করা সহজ কথা নহে। তবে বোধ হয় আমার ভাগ্যে ভক্তির উদয় হইবে না, এই চিন্তায় সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতাম। ইহার মধ্যে চরিতামৃত গ্রন্থে এই কবিতাটী পাঠ করিলাম যথা ঃ—

“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ ন কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।”

হে জগদীশ্বর! আমি ধন জন সুন্দরী কবিতা এ সকল কিছুই প্রার্থনা করি না। জন্ম জন্ম তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

এস্থলে অহৈতুকী ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া মনে করিলাম কোনপ্রকার হেতু হইতে যাহার উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ যাহার উৎপত্তিতে আপনার কোনপ্রকার সাধুকার্য্য কিছুমাত্র সাহায্য করে না তাহাকে অহৈতুকী ভক্তি বলে। দয়াময় ঈশ্বর কৃপা করিয়া এই ভক্তি প্রদান করেন। আমি ভক্তির জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিলে দয়াময় পিতা কখনই নিরাশ করিবেন না। প্রেম-ভক্তিহীন ধর্ম্মসাধনহীন ধর্ম্ম বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে। বাহিরের কতকগুলি অনুষ্ঠান দ্বারা হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয় না, সুতরাং যাঁহারা কোন বাহিরের অনুষ্ঠানকে প্রধান মনে করেন, তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যে প্রতারিত সন্দেহ নাই। কারণ আমি জীবনের পরীক্ষাতে দেখিয়াছি, কেবল বাহিরের অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম মনে করিলে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। হৃদয়ে প্রেমভক্তি হইলে বাহিরের অনুষ্ঠানও হয়, অথচ হৃদয় বিনীত থাকে।

কলিকাতা আসিয়া দেখি ভক্তিভাজন কেশববাবু প্রচারক ভ্রাতাদিগকে লইয়া (তাঁহার কোলুটোলা বাটীতে) প্রতিদিন বিশেষরূপে উপাসনা ও আলোচনা করিতেছেন। তখন প্রতিদিন এমনই জীবন্তভাবে উপাসনা হইত যে, কেহই তাহা ত্যাগ করিয়া শীঘ্র বাসায় আসিতে পারিতেন না। এইরূপ আলোচনা হইতে লাগিল যে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপগুলি অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইবে। সমস্ত স্বরূপকে বিশেষরূপে হৃদয়ে দর্শন করাকেই ধ্যান কহে। এই স্বরূপগুলি এমনি আয়ত্ত করিতে হইবে যে একটী স্বরূপও যেন বৃথা রত না হয়। পূর্ব্বে স্বরূপের মধ্যে পবিত্রতার ভাব ছিল না। এজন্য পরে

'শুদ্ধমপাপবিদ্ধং' এই পদটী সন্নিবেশিত হয়। উপাস্য দেবতার সমস্ত স্বরূপ সমগ্রভাবে ধ্যান না করিলে হৃদয় পূর্ণব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি যে স্বরূপের ধ্যান না করিবেন তাঁহার জীবনে সেই বিষয়ে ক্রটী থাকিবে। তখন বৃথা আলোচনা হইত না, ধ্যান বিষয়ে যাই এইরূপ আলোচনা হইয়াছে অমনি সকলে নির্জ্জনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া ধ্যান ধারণা করিতেন। এইরূপ উপাসনার যে সকল অঙ্গ আছে, প্রত্যেক অঙ্গের প্রত্যেক শব্দকে সাধন করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা হইতে লাগিল। উপাসনার অঙ্গগুলি এতদূর সাধিত হইল যে, সমস্ত দিন অনাহারে উপাসনা করিলেও কিছুমাত্র কষ্টবোধ হইত না। উপাসনা যেমন মধুর হইতে লাগিল, পরস্পরের প্রতি অনুরাগও তদনুরূপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে আমার অগ্রজ ৺ব্রজগোপাল গোস্বামী কলিকাতায় আমার বাসায় আসিয়া "কানু পরশমণি" এই সংকীর্ত্তন করেন, শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্ত্তন করিতে বড় সাধ হইল, ভক্তিভাজন কেশববাবুকে মনের ভাব জানাইলাম। কেশববাবু খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্রমে খোল আসিল, সংকীর্ত্তনের স্বরে সঙ্গীত প্রস্তুত হইল ('জীবনবেদের' ভক্তির সঞ্চার অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিছুদিন কীর্ত্তন করিতে করিতে অনেকে অহৈতুকী ভক্তিযোগে বিগলিত হইলেন।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের এক কল্যাণকর যুগান্তর উপস্থিত হইল। ১৭৮৯ শকের ৯ই অগ্রহায়ণ প্রথম ব্রহ্মোৎসব হইল। ব্রহ্মোৎসবের বর্ণনা কে করিবে? "পৃথিবী স্বর্গের প্রায়, মনুষ্য দেবতা হয়।" সেই দিন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অনেক সময় বোধ হইয়াছিল, যেন স্বর্গে দেবতাদিগের সহিত সমস্বরে পরব্রহ্মের চরণ পূজা করিতেছি। সে দিন ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রবাবু উপাসনায় যোগ দিয়া বিশেষরূপে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার জীবনের যেরূপ সম্বন্ধ, তজ্জন্য তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই উৎসবে অনেকের মন পরিবর্ত্তিত হইল। সমস্তদিন একাসনে ব্রহ্মোপাসনা করিলে কাহারও হৃদয় পরিবর্ত্তিত না হইয়া স্থির থাকিতে পারে না।

ব্রহ্মোৎসবের পর সঙ্কীর্ত্তনের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। কলিকাতায় যেমন কীর্ত্তন হইতে লাগিল, তদ্রূপ অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মসমাজেও কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। পরিশেষে পূর্ব্ববাঙ্গালায় ঢাকা নগরে বিশেষরূপে কীর্ত্তনের উন্নতি হইল। সঙ্গতের ব্রাহ্মভ্রাতাগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ

করিলেন। পূর্ব্ববাঙ্গালার বিশেষতঃ বরিশালের ও ঢাকার সভ্যতাভিমানী কৃতবিদ্যমন্য ব্রাহ্মগণ কীর্ত্তনকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। সোমপ্রকাশ সম্পাদক কীর্ত্তন অনুমোদন করেন না, অতএব কীর্ত্তন ভাল নহে, অনেকের মুখে এইরূপ যুক্তি শ্রবণ করিয়াছি। আমি বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, উপাসনাতে যাঁহাদের অনুরাগ অত্যল্পমাত্র, তাঁহারাই কীর্ত্তনের বিশেষ বিদ্বেষী। ঢাকার দুই একজন প্রাচীন ব্রাহ্ম কীর্ত্তনে দেবেন্দ্রবাবুর মত নাই বলিয়া কীর্ত্তনে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বলেন যে, কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে হৃদয় বিগলিত হইয়া থাকে। এই সময়ে (১৮৬৮ খৃঃ মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ ও এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ) ভক্তিভাজন কেশববাবু সপরিবারে কিছুদিন মুঙ্গেরে অবস্থিতি করেন (মুঙ্গেরকে কেন্দ্র করিয়া পাটনা, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, বম্বেতে প্রচারে যাত্রা করেন)। কয়েক জন ভক্ত বৈষ্ণব মুঙ্গেরে থাকিতেন, তাঁদের ভক্তির বলে মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ জীবন লাভ করিল। কেশববাবু ইঁহাদের ভক্তিভাবে মুগ্ধ ও উপকৃত হন। তাঁহার মধুময় উপদেশে এবং সাধু-দৃষ্টান্তে মুঙ্গেরে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইল। ঘোর সংসারী বিষয়ীলোকও আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মদিগের বিনয়, ভক্তি এবং পরস্পরের মধ্যে প্রণয় সদ্ভাব দেখিলে স্বর্গের অবস্থা বোধ হইত। মুঙ্গেরের জীবন্ত উপাসনায় যোগ দিলে নিতান্ত পাষণ্ডের মনও বিগলিত হইত। অনেক পাপী তাপী মুঙ্গেরের ভক্তিস্রোতে ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন। মুঙ্গেরের সেই অবস্থা দর্শন করিয়া মনে করিয়াছিলাম, ব্রাহ্মসমাজ বুঝি স্বর্গধাম হইল। মনুষ্য সন্তানকে কাতর দেখিলে দয়াময় পিতা স্বর্গের ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। মনুষ্য আপনার দোষে তাহা চিরদিন ভোগ করিতে পারে না। দুই একজন ব্রাহ্মের প্ররোচনায় মুঙ্গেরের ভক্তিস্রোতে কিছু পরিমাণে কুসংস্কার প্রবেশ করিল। কেহ কেহ আমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলেন, কেশবচন্দ্র সেন পূর্ণব্রহ্ম পৃথিবীতে অবতীর্ণ। তজ্জন্য ভক্তির অপব্যবহার হইতে লাগিল। এই (জুলাই ১৮৬৮ খৃঃ) সময়ে কেশববাবু সিমলা পর্ব্বতে গমন করেন। মুঙ্গেরে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন অধিক পরিমাণে অসত্য মিশ্রিত হইতে লাগিল। কেহ সদ্ভাবে সরলভাবে অসত্যের প্রতিবাদ করিলে, মুঙ্গেরের ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে নাস্তিক অবিশ্বাসী পাষণ্ড বলিয়া তিরস্কার করিতেন, সুতরাং কেহ সাহসপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইত না। কিছুদিন পরে কেশববাবু সিমলা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন (২৫ অক্টোবর, ১৮৬৮ খৃঃ)।

তাঁহার আগমনে ভক্তিস্রোত আরও শতগুণ বৃদ্ধি হইল। কিন্তু অসত্য তিরোহিত হইল না। সুতরাং আমি দুঃখিত হৃদয়ে অসত্যের প্রতিবাদ করিলাম। চতুর্দ্দিকে মহা আন্দোলন হইল। অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদক এ বিষয়ে সাহায্য করিলেন, কিন্তু তাঁহারা এই সুযোগে ব্রাহ্মদিগের প্রতি অনেক বিদ্রূপ কটূক্তি বর্ষণ করিয়া স্ব স্ব বিদ্বেষ ভাবও চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক আমার প্রতিবাদে কেশববাবু পর্য্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলেন[৫]। যে সকল বন্ধু বান্ধব অন্তরের সহিত আমাকে স্নেহ করিতেন, তাঁহারাও ঘৃণাপূর্ব্বক আমাকে অবিশ্বাসী, নাস্তিক, পাষণ্ড বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ব্রাহ্মভ্রাতা এতদূর ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন যে, আমাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বোধ হয় আমি যে এখনও কোন কোন ভ্রাতার নিকট ঘৃণিত এবং অবিশ্বাসের পাত্র রহিয়াছি, এই ঘটনাই তাহার মূলকারণ। কেশববাবুর উপদেশ এবং বিশেষ চেষ্টায় যে অসত্য লইয়া বিবাদ হইতেছিল, তাহা তিরোহিত হইল।

৫। ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন প্রণীত 'Biography of a New Faith' Vol II ১৩পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ঃ—"শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপবাবু গত রজনীতে উৎসবের পর বলিয়াছেন যে, "আপনার চরণ আশ্রয় না করিলে পরিত্রাণ নাই" ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথা, প্রতাপবাবু প্রকারান্তরে মনুষ্য পূজা প্রচার করিয়াছেন। আমি ব্রাহ্মধর্ম্মে শিক্ষা করিয়াছি অনন্ত করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহ মানুষের পরিত্রাতা নাই। ঈশ্বর করুণা করিতে অক্ষম হইয়া মনুষ্যের প্রতি পরিত্রাণের ভার দেন নাই। মনুষ্যকে পরিত্রাতা বলা যদি এখনকার মত হয়, তবে আমি বাধ্য হইয়া আপনাদিগের সমাজে যোগ দিতে অক্ষম হইব।

১৭৯০ শক ২৭এ আশ্বিন
সোমবার, প্রয়াগ

বিজয়।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উত্তর ঃ—"একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতীত মনুষ্যের পরিত্রাতা নাই, যিনি ইহা বিশ্বাস করেন তিনিই ব্রাহ্ম। মনুষ্যকে পরিত্রাতা বলিলে কুসংস্কার হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য হয়। আমি যদি কখনও আমাকে পরিত্রাতা বলিয়া থাকি তবে আমাকে উৎপীড়ন কর, পরের কথার জন্য আমি দায়ী নহি।

ভক্তির অপব্যবহারে পৌত্তলিকতা হয়, সত্যের অপব্যবহারে নাস্তিকতা হয়। অতএব সত্যময়ী ভক্তি মধ্যপথ, ইহার বামে পৌত্তলিকতা দক্ষিণে নাস্তিকতা। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কতকগুলি পৌত্তলিক হইতেছেন, কতকগুলি নাস্তিক হইতেছেন। মধ্যপথ বোধ হয় কেহই অবলম্বন করেন নাই, মধ্যপথে না আসিলে প্রকৃত শান্তি নাই।"

বিশেষতঃ যে দুইজন কেশববাবুকে অবতার মনে করিতেন, তাঁহারা কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অস্বীকার করিলেন, তখন তাঁহারা কেশববাবুকে ভণ্ড বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন। এই কারণে বিশেষ সাবধান হইলেন। যাঁহারা অসত্য ব্যবহার করিতেন তাঁহারা আর করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। পুনর্ব্বার আমি বন্ধুদিগের সহিত সম্মিলিত হইলাম। বন্ধুদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র অসদ্ভাব ছিল না। অসত্য দূরীভূত করিবার জন্যই বিশেষ চেষ্টা ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে মুঙ্গেরের যে দুইজন ব্রাহ্মের প্ররোচনায় মুঙ্গেরের সমাজে অসত্য আসিয়াছিল, তাঁহারা এই অসত্যের তিরোধান দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তাভজা হইলেন। কিন্তু অসত্যের প্রতিবাদ না হইলে মুঙ্গেরের অনেক ব্রাহ্ম কর্ত্তাভজা হইতেন সন্দেহ নাই।

এই সকল গোলযোগের কিছুদিন পরে কলিকাতায় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৭৯১ শকের ৭ই ভাদ্র রবিবার এই স্মরণীয় শুভদিন। সে দিনের জীবন্ত উপাসনায় ও স্বর্গীয় উৎসাহে ব্রাহ্মদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। অনেকগুলি (আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ২১ জন) উৎসাহী যুবক (ও দুইটি মহিলা) ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এক্ষন হইতে ব্রহ্মমন্দিরের জীবন্ত উপাসনায় বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। যাঁহারা কোনদিন ব্রাহ্মসমাজে গমন করেন নাই, এমন অনেক লোক ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিতরূপে আসিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মিকা ভগ্নিগণও ব্রহ্মমন্দিরে যবনিকার অন্তরালে বসিয়া পরম পিতার পূজা করিতে সমর্থ হইলেন। কেশববাবুর স্বর্গীয় উপদেশে উপাসক মণ্ডলীর বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। যতদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরাগ থাকিবে, ততদিন প্রত্যেক ব্রাহ্ম কেশববাবুর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিবেন। যিনি উপদেষ্টাকে কৃতজ্ঞতা প্রদান না করেন, তাঁহার অকৃতজ্ঞ হৃদয় কখনই ধর্ম্মার্থী নহে।

কিছুদিন পরে (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭০ খৃঃ) কেশববাবু ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে (২০শে অক্টোবর ১৮৭০ খৃঃ), অল্পদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মবিবাহ বিধি লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতে লাগিল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বিবাহ-বিধির প্রতিবাদ করিতে গিয়া অত্যন্ত অসত্য ব্যবহার অবলম্বন করিলেন। সেই অসত্য ব্যবহারের প্রতিবাদ করাতে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মগণ স্বার্থপরতা অহঙ্কার পরিত্যাগ না করিলে মধ্যে মধ্যে বিবাদ কলহ

হইবেই হইবে, ব্রাহ্মসমাজ শান্তিনিকেতন হইবে না। আপনার ক্ষুদ্রতাকে, দুর্ব্বলতাকে, অসত্য মনকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার না করিয়া যাহা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম কি অন্য কোন ধর্ম্মের শাখা বিশেষ নহে। সর্ব্বদেশে সকল কালে সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার। এক সূর্য্য যেমন সমস্ত পৃথিবীতে আলোক দান করে, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেইরূপ সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার, পূর্ণ, পবিত্র এবং মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। স্বর্গরাজ্য লাভের এই একমাত্র পথ। একাকী ধর্ম্মসাধন করিলে মুক্তি হয় না। সকলে এক পরিবারবদ্ধ হইয়া পরিত্রাণার্থী হইয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করিতে হইবে। একাকী ধর্ম্মপথে গমন করা স্বার্থপরতা। সকলকে লইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। এই সত্য জীবনে পালন করিবার জন্য (৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৭২ খৃঃ বেলঘোরিয়াস্থ উদ্যানে) ভক্তিভাজন কেশববাবু ভারতাশ্রম সংস্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মগণ পরস্পরে স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া দয়াময় পিতার চরণ পূজা করিয়া পরিত্রাণ পাইবেন, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের আদর্শ প্রকাশিত হইবে, ভারতাশ্রমে সেইরূপ উপাসনাদি হইতে লাগিল। দয়াময় পরমেশ্বর বিশেষ বিশেষ অভাব দূর করিবার জন্য সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ উপায় বিধান করেন। ভারতাশ্রমকেও দয়াময়ের সেই বিধান বলিয়া স্বীকার না করিলে ইহার মহত্ত্ব অনুভব করা যায় না। স্বর্গের মহৎ সত্যও মনুষ্যের হস্তে পড়িয়া বিকৃত হইয়া যায়। আমরা যদি চেষ্টা না করি, তবে ভারতাশ্রমের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। যাহাতে পরস্পরের উপাসনা জীবন্ত হয়, সদ্ভাবের বৃদ্ধি হয় সর্ব্বদাই ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই ভারতাশ্রমের পবিত্র কার্য্যসাধনে কেশববাবু ব্রতী হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য ভ্রাতাভগিনীরা ইহার সহকারিতা করিতেছিলেন।

এই উন্নতির সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্ম এই বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিলেন যে "ব্রাহ্মিকাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে যবনিকার অভ্যন্তরে বসিতে দেওয়া উচিত নহে। তাঁহারা বাহিরের পুরুষদিগের সঙ্গে বসিবেন। যদি ভ্রাতা-ভগ্নী এক সঙ্গে উপাসনা করিতে না পারি, তবে আমরাও মন্দিরে উপাসনা করিতে গমন করিব না।" আচার্য্য মহাশয় এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু ব্রাহ্মিকাদিগের জন্য প্রকাশ্য স্থান নির্ণয় করিতে বিলম্ব হইতে

লাগিল। এই অবকাশে প্রস্তাবকারিগণ স্ত্রী-পুরুষে একত্রিত হইয়া পৃথক্ স্থানে ব্রাহ্মসমাজ করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইলেন, কেশববাবু এবং দুই একজন প্রচারকের প্রতি বিরক্ত হইয়া দেবেন্দ্রবাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবেন্দ্রবাবু রাজনারায়ণ বাবুকে ঐ সমাজের উপাচার্য্য মনোনীত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মেরা পৃথক হইয়া প্রকাশ্যে এবং গোপনে প্রচারকদিগের দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। যে সকল ব্রাহ্ম পূর্ব্ব হইতে প্রচারকদিগের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, তাঁহারা এই সুযোগে মন্দিরত্যাগী ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রচারকদিগকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। প্রচারকগণ ধর্ম্মের অনুরোধে সাধারণের হিতের জন্য মধ্যে মধ্যে সাধারণের দুর্ব্বলতা উল্লেখ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য অনেকেই মনে মনে বিরক্ত থাকেন, সময় পাইলেই মনের ভাব প্রকাশ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যাঁহারা অত্যন্ত বিনীত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন, অল্পদিন মধ্যে তাঁহারাও চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধত ও অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। আমি পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া আসিতেছি, বিদ্বেষ কলহ বিবাদ ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজে কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় নাই। অল্প দিনের মধ্যে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সদ্‌ভাব ভ্রাতৃভাব তিরোহিত হইতেছে। প্রকৃত ধর্ম্মার্থী হইয়া পরিত্রাণের জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে সহস্র পরিবর্ত্তনেও ভ্রাতৃভাবের অভাব হয় না। এই আন্দোলনে অনেক অল্প বয়স্ক ব্রাহ্মের বিশেষ অপকার হইয়াছে। কেহ কেহ প্রচারকদিগকে তিরস্কার করিয়া বাটী গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, প্রচারকগণ স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী নহেন, তবে তাঁহাদিগের সহিত স্ত্রী-স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মদিগের বিবাদ হইল কেন? প্রচারকগণ স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী নহেন। তাঁহারা বলেন স্বাধীনতা অন্তরে—স্বাধীনতা বাহিরে নাই। মন জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত না হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। অতএব স্ত্রীজাতিকে প্রথমে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিতে হইবে। জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি দ্বারা কর্ত্তব্য বুদ্ধি বলবতী হইলে, বিবেক প্রস্ফুটিত হইলেই স্ত্রীজাতি স্বাধীনভাবে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি না হইলে মন নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, স্বাধীনভাবে ধর্ম্মভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না। বিলাসিতাকে স্বাধীনতা বলিয়া গণ্য করা যায় না। অতএব স্ত্রীজাতি যাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা

করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বাধীনতার নাম লইয়া স্ত্রীজাতিকে স্বেচ্ছাচারিণী করা উচিত নহে। স্ত্রী-স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মগণ প্রচারকদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের উপর গালি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে যে কিছু শান্তি সদ্ভাব ছিল, এই আন্দোলনে তাহাও তিরোহিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে আচার্য্য মহাশয় মন্দিরে আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া মন্দিরত্যাগী ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ আগমন করিলেন না। তাঁহারা রাজনারায়ণ বাবুকে উপাচার্য্য করিয়া পৃথক সমাজই রাখিলেন। রাজনারায়ণ বাবু এই অবকাশে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণ মত প্রচার করিতে বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন।

আমি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া যে যে পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়াছি এবং প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল অসদ্ভাব অশান্তি উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজকে ছারখার করিয়াছে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিলাম। উল্লিখিত বিষয় সকল স্থিরভাবে আলোচনা করিলে বর্ত্তমান সময়ের অসদ্ভাব বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ অনুভূত হইবে।

প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিত্রাণার্থী হইয়া ঈশ্বরলাভে ব্যাকুল হইলে কোন প্রকার বিবাদই হইতে পারে না। অতএব নিম্নে যে সকল নিয়ম নির্দ্দেশ করিতেছি ব্রাহ্মগণ যদি তদনুরূপ জীবনযাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

১। প্রতিদিন অন্যূন তিনবার পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে। অভ্যস্ত কতকগুলি বাক্য বলিয়া উপাসনা শেষ না করিয়া জীবন্তভাবে উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসাধন আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথমে বাহ্য জগতের শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের শোভাসৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইবে। এমনই অভ্যাস করিতে হইবে যে, বাহ্য সৌন্দর্য্যে ঈশ্বরের শোভা না দেখিলে সকল সুন্দর পদার্থকেই শূন্য বোধ হইবে, যেখানে প্রকৃতি স্বাভাবিক শোভায় পরিপূর্ণ, সেখানে ঐ প্রকার সাধন করা কর্ত্তব্য। এই সাধন অভ্যস্ত হইলে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে সকল স্থানেই উপলব্ধি করা যাইবে। পাপ করিতে আর সাহস থাকিবে না। এই সাধন বিশেষরূপে আয়ত্ত হইলে মন আর উহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে না। তখন মনে হইবে যে চক্ষু যদি অন্ধ হয়, তবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে

তাঁহাকে কিরূপে দর্শন করিব ? অতএব দয়াময় নামের মধ্যে তাঁহাকে সাধন করিতে হইবে। নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইলে নাম সাধন সার্থক হইবে। নাম সাধন করিতে করিতে নাম আর তিনি অভিন্ন হইবেন। তখন নামকে গুটিকত অক্ষর বলিয়া বোধ হইবে না, নামের ভাবের মধ্যে পূর্ণব্রহ্মকে দর্শন করিয়া প্রাণমন শীতল হইবে। নাম সাধন হইলে অন্তরে পিতার সহিত যোগসাধন করিতে বিশেষ ব্যাকুলতা হইবে। অন্তরে দয়াময় পিতা প্রকাশিত হইবেন, হৃদয় অনিমেষ লোচনে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবে। এই যোগসাধনই পরলোকের একমাত্র সম্বল। এই ত্রিবিধ সাধন দ্বারা মন বিনীত হইয়া দীন হীন ভাবে পিতার চরণে পড়িয়া থাকে। নিন্দা প্রশংসায় সাধকের মন বিচলিত হয় না ; সুতরাং তাঁহার নিকট বিবাদ বিসম্বাদ অসম্ভব হয়। প্রত্যেক ব্রাহ্ম এরূপ সাধন আরম্ভ না করিলে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হইবে না। সাধন না করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

২। কেহ বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিবেন না। মনে যাহা সত্য জানিবেন, কার্য্যে তাহা পরিণত করিবেন। সহস্র ক্ষতি হইলেও কপট আচরণ করিতে পারিবেন না।

৩। কেহ ভ্রাতার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

৪। সুরাসক্তি, মাদক-সেবন, কোন প্রকার মিথ্যাকথা, মিথ্যা ব্যবহার, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, ব্যভিচার, পরনিন্দা, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি পাপাচরণ করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে।

৫। ব্রাহ্ম যেমন ঘৃণার সহিত পাপকার্য্য পরিত্যাগ করিবেন, তেমনই শ্রদ্ধার সহিত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। পাপ করা যেমন অধর্ম্ম, কর্ত্তব্য পালন না করা সেইরূপ অধর্ম্ম।

৬। কাহার দোষ দেখিলে, তাহার দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে এবং গোপনে তাঁহাকে সংশোধন করিবে ; ভ্রাতার দোষ লইয়া উপহাস করিবে না।

৭। যেমন নির্জ্জনে উপাসনা করিবে, তেমনি নিয়মিতরূপে সামাজিক উপাসনা করিবে।

৮। স্বীয় দুর্ব্বলতাকে সমর্থন না করিয়া বিনীতভাবে দুর্ব্বলতা স্বীকার করিবে।

৯। কেহ ঈশ্বরের নাম লইয়া উপহাস করিলে কর্ণে হস্ত দিয়া তাহার কথাকে অগ্রাহ্য করিবে।

১০। ঈশ্বর, পরলোক, প্রার্থনা, পাপপুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তি, অনন্ত উন্নতি প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

এই দশটী নিয়ম ব্রাহ্মসমাজে শাসনরূপে না থাকিলে ব্রাহ্মগণ সদ্‌ভাব ও শান্তি ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন না। ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান জীবন ধর্ম্মহীন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাধন আরম্ভ না হইলে প্রকৃত ধর্ম্ম ব্রাহ্মসমাজে সংস্থাপিত হইবে না। ব্রাহ্মগণ যে সময়টুকু বিবাদ করিয়া অতিবাহিত করেন, সে সময়টুকু দিয়া সাধন করিলে জীবনের প্রকৃত মঙ্গল সংসাধিত হয়। সমস্ত অশান্তি নিবারণের একমাত্র উপায় ব্রহ্মসাধন। ব্রাহ্মগণ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মসাধন করিয়া শান্তিলাভ করেন, এই আমার বিশেষ নিবেদন।

আমার জীবনের যে অংশ উল্লেখ করিলে লিখিত বিষয় বোধগম্য হইবার সুবিধা হইবে, এই প্রস্তাবে সেই অংশ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। তজ্জন্য যদি কিছু দোষ হইয়া থাকে, ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

এই পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার পর হইতে (১৮৭২ খৃঃ) এ পর্য্যন্ত যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। কেশববাবু বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া ভারত সংস্কার সভা স্থাপন করেন (২রা নবেম্বর ১৮৭০ খৃঃ)। স্ত্রীশিক্ষা, সুলভ সমাচার, দাতব্য, সুরাপান নিবারণ, সামান্য লোকদিগকে শিক্ষা দান বিষয়ে বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য হইতে লাগিল। মহিলাদিগকে শিক্ষা দান এবং বেহালা গ্রামে রোগীদিগকে ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি গুরুতর পরিশ্রমে আমার শরীর ভগ্ন হইয়া গেল। হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের পীড়া হইল। কিছুদিন চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া দিনাজপুর, রঙ্গপুর, কলিকাতা, গোবরাছড়া, কোচবেহার প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচার জন্য গমন করি। কোচবেহারে পুনর্ব্বার পীড়া বৃদ্ধি পাওয়াতে শান্তিপুরে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করি। এই সময়ে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের সহিত কেশববাবুর আলাপ হয়। তাঁহার জীবন্ত বৈরাগ্য দর্শনে[৬]

৬। এই কথা ঠিক নহে, কারণ রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের সহিত আলাপ হইবার বহুপূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সদলে বৈরাগ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৫ খৃঃ যে সময়ে

কেশববাবু বৈরাগ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কলিকাতায় আসিতে পত্র লেখেন, আমি কলিকাতায় আসিয়া দেখি কেশববাবু স্বহস্তে রন্ধন করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে যাহাতে বৈরাগ্য ভাব প্রবেশ করে তজ্জন্য তিনি বাস্তবিক চেষ্টা করিতেছেন। সেই সময় অনেকের মুখে বৈরাগ্যের প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি। আবার কতিপয় ব্রাহ্ম বৈরাগ্যের ঘোর বিরোধী হইয়া কেশব বাবুকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজে বৈরাগ্য কেন? বৈরাগ্য কথাও যেন ব্রাহ্মসমাজকে স্পর্শ না করে। খাও দাও আমোদ কর, মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের নাম কর, অত বাড়াবাড়ী কেন? ইহার পরই সাধন ভজনের জন্য অনেকের মনে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। সাধন ভজনের নানা উপায় স্থির করিতে করিতে কেশববাবু যোগ ও ভক্তি সাধনের উপায় প্রকাশ করিলেন।

প্রিয় বন্ধু অঘোরনাথ গুপ্ত যোগ এবং আমি ভক্তি সাধন করিব। শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় জ্ঞান সাধন এবং শ্রীমতী মুক্তকেশী ভাদুড়ী[৭] সেবা অর্থাৎ কর্ম্ম সাধন করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া কেশববাবু যোগ ভক্তি সাধনের নিয়মিতরূপে উপদেশ প্রদান করিলেন। সাধনের জন্য কোন্নগরের নিকট মোড়পুকুর গ্রামে একটী উদ্যান ক্রয় করিয়া "সাধন কানন" স্থাপন করিলেন।

এইরূপে সাধন ভজন চলিতেছে। এ সময়ে বিশেষ কোন দুর্ঘটনা পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হওয়াতে, একদিন কতিপয় প্রচারকের সহিত আমার বাদানুবাদ হয়। এই সকল কারণে আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে বাগআঁচড়া গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করিলাম।

বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উদ্যানে একদিন নির্জ্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছি। হঠাৎ আমার মধ্যে যেন একটী জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল এবং কে যেন বলিল তুই আর আপনাকে বদ্ধ রাখিস্ না। গণ্ডির মধ্যে থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। ভাদ্র মাসে বাগআঁচড়ার ব্রহ্মোৎসব হইল তাহাতে স্বর্গ হইতে প্রেম স্রোতঃ প্রবাহিত হইল। এমন অবস্থা জীবনে কখনও লাভ করি নাই।

পরমহংসদেব 'বেলঘোরিয়া তপোবনে' গিয়া ব্রহ্মানন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন সেই সময়ে ব্রহ্মানন্দ সেখানে সদলে যোগ ও বৈরাগ্য সাধনে নিযুক্ত ছিলেন এবং স্বহস্তে রন্ধনাদি করিতেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে প্রচারের জন্য এবং পরে অসুস্থতার জন্য বহুদিন বাহিরে বাহিরে থাকিতে হইয়াছিল। কাজেই ঐ সময়ের সাধনধারার সকল বিষয় তিনি সঠিক অবগত ছিলেন না। (উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র' দ্রষ্টব্য)।

৭। ইনি গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী। পরে ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তকে সেবাব্রত দেওয়া হয়।

এদিকে কলিকাতা হইতে প্রচারক ভ্রাতারা পত্র লিখিতে লাগিলেন যে, তুমি শুষ্ক হইয়া মরিবে। মাতৃস্তন পান না করিলে বাঁচিবে কি রূপে? এই পত্র পাইয়া আমি অবাক্ হইলাম। আমি নিজে আছি ভাল, তাঁহারা গালি দেন ইহার কারণ কি?

আবার আমাকে কে যেন ডাকিয়া বলিল, যদি ধর্ম্মজীবন চাও আর গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিও না।

আমি পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর ন্যায় উড়িতে গিয়া পাখায় বল পাই না। তখন বুঝিলাম ইহা গণ্ডির পরিণাম।

ইহার পর কেশববাবুর কন্যার বিবাহ[৮] লইয়া মহা আন্দোলন, তাহাতে আমিও কেশববাবুর প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল (১৫ই মে ১৮৭৮ খৃঃ)। ব্রাহ্মসমাজ কোন মনুষ্যের উপর নির্ভর করেন না। যখনই মানুষ ব্রাহ্মসমাজে প্রাধান্য লাভের জন্য যত্ন করিয়াছেন, তখনই ব্রাহ্মসমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। স্বয়ং পরমেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও বিধাতা। কোন মনুষ্য ইহার রক্ষক নহে।

আমি জীবনের পরীক্ষায় বুঝিয়াছি যে, ব্রাহ্মসমাজ কোন দল কিম্বা সম্প্রদায় নহে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, য়িহুদী সকল সম্প্রদায়েরই সেই এক পরব্রহ্মের পূজা করা লক্ষ্য। সেবা, ভক্তি, পবিত্রতা যেখানে সেখানেই ধর্ম্ম। ধর্ম্মই উদ্দেশ্য, দল উদ্দেশ্য নহে। নিজের অন্তরে কতদূর ধর্ম্মলাভ হইল তাহারই প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। দলাদলি না করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের জন্য লালায়িত হইলে আর ব্রাহ্মসমাজ লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিতে হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যে প্রণালীতে উপাসনা সাধন ভজন চলিতেছে, তাহার অধিকাংশ পরোক্ষ। অতএব প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, উপাসনার সাধন ভজনও প্রত্যক্ষ এবং জীবন্ত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া যথার্থ ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হন তাহা হইলে দুঃখীর কথা বাসী হইলে ভাল লাগিবে।

৮। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র' এবং ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন প্রণীত 'Keshub Chunder Sen and the Cooch Behar Betrothal 1878' (1930) ।

উপাসনার প্রয়োজনীয়তা।*

রবিবার, ১লা ভাদ্র, ১৭৯৬ শক; ১৬ই আগষ্ট, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।

শরীরের পক্ষে আহার যেমন প্রয়োজন, তেমনই আত্মার পক্ষে উপাসনা প্রয়োজন। শরীরের রোগ হইলে আহারে অরুচি হয়, সেইরূপ যখন উপাসনাতে অরুচি হয়, তখন নিশ্চয়ই জানিবে, আত্মার কোন পীড়া হইয়াছে। অন্নে অরুচি হইলে মনুষ্য এককালে আহার পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ উপাসনাতে অরুচি হইলে যদি আমরা এককালে উপাসনা পরিত্যাগ করি, ভয়ানক রূপে আমাদের আত্মার দুর্গতি হইবে। উপাসনাতে অরুচি হইয়া যদি আত্মা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়, সেই উপাসনা করিলেই পুনর্ব্বার তাহা সবল হইবে। শরীর-রক্ষার জন্য চিরকালই অন্নাহার করিয়া আসিতেছি, দুদিন রোগবশতঃ আহার না করিলে অন্ন অন্ন করিয়া প্রাণ অস্থির হয়। শরীরের পক্ষে যাহা প্রয়োজন, অত্যন্ত পুরাতন হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা যায় না। সেইরূপ ভক্তের পক্ষে, জীবাত্মার প্রাণের পক্ষে যে উপাসনা অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা পুরাতন বলিয়া পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই যে আত্মার অমঙ্গল হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? উপাসনা ভিন্ন আত্মা জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে বস্তুর যত প্রয়োজন, সেই বস্তুর সহিত তত ঘনিষ্ঠ এবং মধুর সম্পর্ক। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, অতি পুরাতন, কিন্তু কে এ সকলকে পুরাতন বলিয়া ঘৃণা করে? তবে ঈশ্বর পুরাতন বলিয়া কি আমাদের নিকট অবজ্ঞার আস্পদ হইবেন? যখন আহারে অরুচি থাকে, তখন সুস্বাদু খাদ্য পাইলেও আহার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে সামান্য শাকান্ন দাও, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট হইবে। সেইরূপ যাহার উপাসনায় অরুচি, তাহার নিকট যদি কোন ভক্ত প্রেমযোগে মধুর ভাবে উপাসনা করেন, এবং মৃদঙ্গ করতাল সহিত অতি সুমিষ্ট সংকীর্ত্তন হয়, তাহাতেও তাহার মন মুগ্ধ হইবে না। উপাসনায় যাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা, তাঁহার নিকট কেবল দয়াময় নামটী উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার মন প্রেমরসে গলিয়া যাইবে। যাহারা বলে, ভাল গান হইল না, ভাল বাদ্য হইল না, ভাল বক্তৃতা হইল না বলিয়া আমার উপাসনা হইল না, তাহার উপাসনায় অরুচি হইয়াছে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের দয়াল নামের যে মহিমা, তাহাতে যদি প্রেমরস উথলিত না হয়, তবে

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

জানিবে, আত্মাতে রোগ জন্মিয়াছে। ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁহার নামে অরুচি নিশ্চয়ই আত্মার পতনের কারণ। অতএব যখনই নামে অরুচি দেখিবে, তৎক্ষণাৎ অন্তরের পীড়া অনুসন্ধান করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে।

উপাসনা ভিন্ন আত্মা বাঁচিতে পারে না। প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরের সহবাসে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ আত্মা সরস থাকে। মৃত্তিকা হইতে বৃক্ষকে উৎপাটিত কর, অচিরে তাহা মরিয়া যাইবে, সেইরূপ রসস্বরূপ পরমাত্মার মধ্যে যদি আমাদের আত্মা বদ্ধমূল না হয় কদাপি তাহা সজীব হইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মগণ! যাহাতে ঈশ্বরে নিহিত হইয়া আমরা প্রতিদিন তাঁহার প্রেমরস পান করিতে পারি এইজন্য বিশেষ সাধন কর। উপাসনার দ্বারা তাঁহার মধ্যে লুকায়িত থাকিতে হইবে। যদি যথার্থ ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হইতে চাও, তবে উপাসনা তোমাদের প্রাণের আহার হইবে। যতকাল জীবন ধারণ করিবে, যতদিন আত্মা থাকিবে, অনন্তকাল তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনা বাহিরের কোন ব্যাপার নহে। বাদ্য নহে, সঙ্গীত নহে, বাক্য নহে, সুললিত শব্দও নহে। সম্মুখে এই জগতের কর্ত্তা পরমেশ্বর জাজ্বল্যরূপে, জীবনরূপে, অভয়দাতারূপে বর্ত্তমান, সেই পুরাতন সুন্দর পুরুষ আত্মাকে আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে উজ্জ্বলরূপে দেখিয়া যখন জীবাত্মা স্বর্গীয় প্রেমে বিগলিত হয়, তখনই তাহার প্রকৃত উপাসনা হয়। প্রকৃত উপাসনাতে আত্মা যতই স্পষ্টরূপে ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতে পায়, ততই ইহা পবিত্র প্রেমে আর্দ্র হইয়া উজ্জ্বলতর হয়। সেই পবিত্র পুরুষের সঙ্গে আমরা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছি, তিনি নিমেষের জন্যও কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বিশ্বাসনয়নে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া, প্রেম ভক্তিতে বিগলিত হইয়া, তাঁহার চরণতলে বাস করিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি করা ও পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার চরণতলে বসিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাই যথার্থ উপাসনা। ইহা ভিন্ন উপাসনা আর কিছুই নহে। এই উপাসনার অধিকার লাভ করিবার জন্য সঙ্গীত করিতে হইবে, উপাসকদিগের সংসর্গে থাকিতে হইবে এবং অন্য যে সমুদয় বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করিলে সরস এবং সত্যভাবে জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়, সে সকলই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব সাবধান, সকলে সতর্ক হইয়া যাহাতে প্রতিদিন ভালরূপে উপাসনা করিতে পার, তাহার জন্য বিশেষরূপে যত্নশীল হও। প্রতিদিন অন্যূন তিন বার উপাসনা করিবে।

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, সায়ংকাল, এই তিন কাল উপাসনার প্রশস্ত সময়; কিন্তু কেবল তিনবার উপাসনা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে না। সর্ব্বদা সমস্ত দিন যাহাতে ঈশ্বরকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিতে পার, তাহার জন্য সাধন ভজন করিবে। কার্য্যের সময়, পাঠের সময়, যে কোন বিষয়ে নিযুক্ত থাক, বারম্বার সেই স্বর্গীয় প্রভুকে স্মরণ করিবে। উপাসনাতে এতদূর দৃঢ় থাকিবে যে, কোন দিন ভ্রম-বশতঃ উপাসনা না করিয়া মহা সৎকার্য করিলেও, মহাপাপ করিয়াছ মনে হইবে। উপাসনা আত্মার অন্ন পান হইবে, ক্রমে ক্রমে উপাসনা এতদূর আয়ত্ত হইবে যে, প্রতি নিঃশ্বাসে উপাসনা হইবে। যথাসময়ে উপাসনা কর নাই ইহা স্মরণ মাত্র যদি অন্তরে গ্লানি এবং গভীর দুঃখ না হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, আত্মাতে কোন গূঢ় পীড়া প্রবেশ করিয়াছে। উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিয়া অন্তরে পুণ্য শান্তি সম্ভোগ করিব, এই জন্য তিনি আমাদিগকে এই উচ্চ অধিকার দান করিয়াছেন। অনেকে বলেন, আমরা কার্য্যালয়ে যাই, সুতরাং কার্য্যের অনুরোধে অনেক সময় উপাসনা পরিত্যাগ করিতে হয়; কিন্তু আমরা কোন ব্রাহ্মের মুখে এই কথা শুনিব না। কার্য্যের অনুরোধে কোন ব্রাহ্ম উপাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন না; বরং উপাসনার অনুরোধে নিশ্চয়ই আর সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। উপাসনা প্রাণের আহার, রীতিপূর্ব্বক এই আহার গ্রহণ না করিলে কোন ব্রাহ্ম বাঁচিতে পারিবেন না। কল্পনা দ্বারা আহার হয় না। সেইরূপ যতক্ষণ আমরা নিজের বুদ্ধি কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের চরণে আরাম লাভ না করিব, ততক্ষণ কিছুতেই প্রকৃত উপাসনা হইবে না। আমরা ভিক্ষুক, আমাদের কোন অধিকার নাই, যতক্ষণ দাতার দান করিতে ইচ্ছা না হইবে, ততক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, তিনি আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যদি যথার্থ সরল ভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করি, চতুর্দ্দিকে এবং অন্তরে তাঁহার অতুল সৌন্দর্য্য ও মহিমা দেখিয়া মুগ্ধ হইব। প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক ব্যক্তি, সমস্ত জগৎ তখন তাঁহাকে দেখাইয়া দিবে। পুষ্পের সৌন্দর্য্যে, চন্দ্রমার লাবণ্যে এবং অবশেষে নিজের প্রাণের মধ্যে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া পবিত্র হইব। অতএব সকলেই সরল প্রার্থী এবং উপাসনাশীল হইয়া ঈশ্বরের মধ্যে নিমগ্ন থাক। উপাসনা না করিলে প্রাণ অস্থির হইবে, আত্মা শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া যাইবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা সকলেই প্রতিদিন উপাসনা দ্বারা আত্মার চিরমঙ্গল সাধন করিতে পারি।

তিনি কোথায় ?*

(পঞ্চম ভাদ্রোৎসব)

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৮ই ভাদ্র ১৭৯৬ শক ;

২৩শে অগাষ্ট, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

এই ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি রবিবারে আমরা দয়াময় ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকি। অদ্য এই রবিবাসরে সমস্ত দিন আমাদের সেই চিরপরিচিত পিতাকে লইয়া উৎসব করিব, এই আশা করিয়া সকলে এই সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকালে এখানে সমবেত হইয়াছি। ব্রাহ্মদিগের উৎসব কি ? এবং আমাদের উৎসবকর্ত্তা কে ? যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, সেই অতীন্দ্রিয় মহাপুরুষের উজ্জ্বল প্রেমে উন্মত্ত হওয়া আমাদের উৎসব, এবং তিনি স্বয়ংই এই উৎসবের অধিষ্ঠাতা এবং উপাস্য দেবতা। ভ্রাতৃগণ! কোথায় তিনি ? তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী সকলে কি দেখিতেছেন ? যদি আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্যে মগ্ন না হইলাম, তবে আর আমাদের উৎসব কোথায় ? তাহা হইলে যে, আমাদের পক্ষে চারিদিক্ শূন্য, অন্ধকার! আমাদের প্রত্যেকের নিকট তিনি আজ বিশেষরূপে উপস্থিত, যদি তাঁহাকেই না দেখিলাম, তবে কাহাকে লইয়া উৎসব করিব ? আমাদের দয়াময় পিতা, যিনি এই উৎসবক্ষেত্রে আসিয়াছেন, সমস্ত জগৎ তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। পৃথিবীর বৃক্ষলতাসকল তাহাদের স্বজাতীয় ভাষায় বলিতেছে, এই দেখ, প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর প্রাণরূপে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান। প্রস্ফুটিত পুষ্পসকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল, "তোমরা যাহাকে লইয়া উৎসব করিবে, এই দেখ, সেই দেবতা আমাদিগকে কেমন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া আমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন।" চন্দ্রমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা যাঁহাকে লইয়া উৎসব করিব, তিনি কোথায় ? চন্দ্রমা বলিল, "এই যে আমার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দেখিতেছ, ইহার মধ্যে তোমাদের পরম সুন্দর পিতা অধিবাস করিতেছেন।" এইরূপে প্রত্যেক বস্তুই, কেহ বলে আমাদের মধ্যে ঈশ্বর প্রাণরূপে বর্ত্তমান, কেহ বলে আমাদের মধ্যে তিনি সৌন্দর্য্যের আকর-

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

রূপে বর্ত্তমান, কেহ বলে তিনি আমাদের পুণ্যসিন্ধুরূপে বর্ত্তমান, তথাপি আমাদের এই পাপচক্ষু কেন তাঁহাকে দেখিতেছে না? সকল স্থানেই তিনি আছেন, সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার পবিত্র আবির্ভাব, তবে কেন এই নাস্তিক হৃদয় তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইল না? এই নাস্তিক চক্ষুকে আমরা সংশোধন করিলাম না, বিশ্বাসী ভক্ত হইয়া কেমন করে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া উন্মত্ত হইতে হয়, আমরা জানিলাম না।

ব্রহ্মমন্দিরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি যে মাতার ন্যায় আমাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছ, তুমি কি জান, আমরা যাঁহাকে লইয়া উৎসব করিব, তিনি কোথায়? ব্রহ্মমন্দির বলিল, এই যে আমার মধ্যে তিনি পূর্ণভাবে বর্ত্তমান, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিতেছ না? তোমরা কি অন্ধ হইলে? তোমাদের কি দৃষ্টিশক্তি নাই? এই যে তিনি তোমাদের সকলকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। যদি তাঁহাকেই না দেখিলে, তবে কাহাকে লইয়া তোমরা উৎসব করিবে? প্রেমময় দেবতা, আমাদের পূজা গ্রহণ করিবার জন্য এখানে আছেন, তবে কেন আমরা তাঁহার প্রেমে প্রমত্ত হইতেছি না? আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য তিনি এই উৎসবক্ষেত্রে আসিয়াছেন, তবে কেন আমাদের কঠোর হৃদয় আগ্রহ করিয়া এবং উৎসাহী হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছে না? নাস্তিক হৃদয় বলিতেছে, আমি কত দিকে ধাবিত হইব, আমি যে বিষয়কে ভালবাসি, বিষয়ের জন্য আমি সর্ব্বদা লালায়িত। হৃদয়ের এই কঠোর কথা শুনিয়াও দয়াময় ঈশ্বর আমাদের কাছে আসিলেন, আমরা তথাপি তাঁহার অপমান করিলাম, পিতাকে হৃদয়ে ধারণ করিলাম না, তাঁহার মধুর আহ্বান শুনিলাম না। বাস্তবিক কি ভ্রাতৃগণ! এই জগতে পিতা হইতে আমাদের অন্য কোন ব্যক্তি অধিক আদরণীয় কিম্বা অধিক ভালবাসার আস্পদ আছে? ঐ শুন, প্রেমময় পিতা আমাদিগকে কি বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "সন্তানগণ! আজ তোমরা আমাকে আহ্বান করিয়াছ, আমি উপস্থিত, এখন আমাকে লইয়া উৎসব কর।" কিন্তু আমাদের পাষণ্ড হৃদয় বলিতেছে, ব্রাহ্মগণ! তোমরা যাঁহাকে লইয়া উৎসব করিবে মনে করিয়াছ, তাঁহাকে আমি ভালবাসি না। কি ভয়ানক নিদারুণ কথা! সেই প্রেমদাতা ঈশ্বর হৃদয়ে বর্ত্তমান; কিন্তু আমরা কিনা তাঁহাকে ভালবাসি ন বলিয়া, তাঁহাকে লইয়া উৎসব করিতে পারিতেছি না। ভ্রাতৃগণ! এই দয়াম পিতা, যাঁহাকে তোমরা পরিত্যাগ করিতেছ, এত অপমান করিতেছ, তিনি ?

তোমাদিগকে এক নিমেষের জন্যও পরিত্যাগ করেন নাই, ঘোর বিপদের মধ্যে এবং মৃত্যুর সময়েও তিনি আমাদিগকে তাঁহার অমৃত-ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া থাকিবেন। অদ্য তোমাদের চরণ ধরিয়া বলিতেছি, এমন দয়াল পিতাকে আজ তোমরা পদাঘাত করিয়া দূর করিয়া দিও না। ইঁহা অপেক্ষা আর কাহাকেও অধিক ভালবাসিও না। যে জঘন্য নরাধম আমরা, যাহারা তাঁহার বারম্বার অপমান করিল এবং যিনি বিলক্ষণরূপে জানিয়াও যে, ইহাদের কাছে গেলেই আমার অপমান হইবে, তথাপি তিনি আমাদের হৃদয়দ্বারে আসিয়াছেন। আমাদের উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া তিনি আসিয়াছেন, এখন কি আমরা "নির্দ্দয় হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিব?" যদি পিতাকে ডাকিয়া আমরা তাঁহার এত অপমান করিতে পারি, তবে এখনই আমরা বিনষ্ট হইয়া যাই। (এ সমুদয় কথা বলিতে বলিতে ভক্তের হৃদয় গূঢ়রূপে স্বর্গীয় গাঢ় প্রেমে দ্রবীভূত হইতেছিল, বারম্বার বাক্যরুদ্ধ হইতে লাগিল, এবং এই সময়ে কয়েকটী ব্রাহ্মিকা ভগ্নী এবং ব্রাহ্ম ভ্রাতাও স্বর্গীয় প্রেমের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন) সেই উৎসবকর্ত্তা আমাদের হৃদয়কুটীরদ্বারে আসিয়াছেন, এস, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রাণসিংহাসনে ধারণ করি। তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত হই এবং তাঁহাকে লইয়া সমস্ত দিন উৎসব করি। আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য তিনি ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছেন, তিনি দূরে নহেন, তিনি সম্মুখে, তিনি হৃদয়ে বর্ত্তমান। সেই প্রেমদাতা ঈশ্বরকে লইয়া প্রমত্ত হইব, এই আশা করিয়া আমরা উৎসবে প্রবৃত্ত হই। দয়াময় ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁহাকে লইয়া সমস্ত দিন আমরা তাঁহার উৎসব করি!

আত্মার দীনতা।*

সায়ংকাল, রবিবার, ৮ই ভাদ্র, ১৭৯৬ শক ;
২৩শে আগষ্ট, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য সমস্ত দিন যে অপার আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা কি বিস্মৃত হইব ? এই নিকৃষ্ট জীবনে ঈশ্বর এত দয়া করিবেন, ইহাত স্বপ্নেও জানিতাম না। পিতা তাঁহার নিজগুণে হৃদয়ে আসিলেও যে, হৃদয় তাঁহাকে গ্রহণ করে না, হৃদয়ের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, অদ্য হয়ত নিরাশ হইতে হইবে ; কিন্তু এই পাপ-হৃদয়ে দয়াময় যে আজ আশাতীত সুখ দিলেন। প্রাণের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দেখিলাম। যাঁহাকে অদ্য প্রাণ মন, সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলাম, আবার কি তাঁহাকে দূর করিয়া দিব ? সেইত পাতকী আমি, আমার অসাধ্য কি ? হৃদয় কঠিন, অনায়াসে আবার পিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। তবে কি উপায়ে পিতাকে হৃদয়ে রাখিব ? ইহার জন্য ব্যাকুল হইয়া কোন প্রাচীন সাধকের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই যিনি প্রাণকে অধিকার করিলেন, তাঁহাকে কি প্রকারে, চিরকাল হৃদয়ে রাখিব ? সেই মলিনবেশধারী সাধক বলিলেন, ইহা সহজ কথা নহে ; দেখ, আমি তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিবার জন্য শরীর শীর্ণ করিয়াছি, সংসার পরিবার পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, তথাপি তাঁহাকে স্থির রাখিতে পারিতেছি না। যাঁহাকে হৃদয়ে স্থির রাখিবার জন্য সহস্র সহস্র ভক্ত কঠোর সাধন করিয়াছেন, তাঁহাকে কি উপায়ে হৃদয়ে রাখিবে, ইহা সামান্য প্রশ্ন নহে। এই কথা শুনিয়া, আবার তাঁহাকে বলিলাম, প্রাণেশ্বরকে হৃদয়ে রাখিতে না পারিলে প্রাণ যে বাঁচে না। ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, আমি চব্বিশ বৎসরের সাধনের পরীক্ষায় এই জানিয়াছি, তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিবার জন্য বাস্তবিক যদি কোন উপায় থাকে, আত্মার দীনতা। অহঙ্কারীর হৃদয়ে তিনি থাকেন না, যদি তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিতে চাও, তৃণের ন্যায় নীচ হইতে হইবে, এবং সকলের পদধূলি হইয়া হৃদয়ের সমস্ত অভিমান দাম্ভিকতা চূর্ণ করিতে হইবে। প্রকৃত বৈরাগী হইয়া সকলের দাস না হইলে, তাঁহাকে

---

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

হৃদয়ে রাখিবার অধিকার জন্মে না। এই কথা শুনিয়া নিরাশা এবং দুঃখে আমার হৃদয় আরও বিদ্ধ হইল। মনে করিলাম, এত বড় ভক্ত যিনি চব্বিশ বৎসর সাধন করিয়াও ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থির রাখিতে পারিতেছেন না, আমার এই দাম্ভিক মন কিরূপে তাঁহাকে ধারণ করিবে? আমি কি করিব? পিতার কৃপা ভিন্ন আমার আর আশা ভরসা নাই। ভ্রাতৃগণ! আপনারা যদি সকলেই আমার মস্তকে পদধূলি দেন, তবেই আমি বাঁচিতে পারি। তৃণের ন্যায় নীচ হইবার জন্য মহাত্মা চৈতন্যের যে উপদেশ শুনিলাম, তাহা সহজ কথা নয়। দয়াময় পিতার আশীর্ব্বাদ এবং সমুদয় ভাই ভগ্নীদের পদসেবা করিয়া, যদি তৃণের ন্যায় নীচ হইতে পারি, তবেই এই জীবন সার্থক হয়।

ধর্ম্মসাধনের আবশ্যকতা।*

(ব্রাহ্মবন্ধু সভা)

বৃহস্পতিবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৭৯৬ শক ;
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রত্যেক কার্য্যেই সাধনের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষে অতি পুরাতন সময় হইতে, সাধন এই শব্দটী কেবল ধর্ম্ম সম্পর্কেই নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে। কোন বিষয় নাই যাহা সাধন অথবা উদ্যম, চেষ্টা, অভ্যাস, এবং অধ্যবসায় দ্বারা অর্জ্জন করিতে না হয়। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বিষয় যে ধর্ম্ম, তাহা যে সাধন দ্বারা লাভ করিতে হইবে তাহাতে মতান্তর অসম্ভব। প্রাচীন মহর্ষিগণ ধর্ম্ম সাধন সম্পর্কে অনেক প্রকার প্রণালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সাধন সম্পর্কে এই দেশে যে উচ্চ আদর্শ আছে, তাহা সাধক মাত্রেরই সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। ধর্ম্ম আন্তরিক বিষয়, তাহা অর্জ্জন করিতে বহু আয়াস আবশ্যক। সাধন ভিন্ন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না, জীবন পবিত্র করা যায় না। আমাদের দেশীয় ধর্ম্মপুস্তকে সাধনের অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সকল রহিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত "ধ্রুব"। এই জীবন সত্যই হউক বা কাল্পনিক হউক ; কিন্তু যে অন্তর হইতে ইহা নির্গত হইয়াছে তাহা কত মহৎ। ধ্রুব পঞ্চমবর্ষের বালক হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিলেন, তথাপি সাধনের প্রয়োজন হইল। নারদের নিকট দীক্ষিত হইয়া সাধন করিয়া ঈশ্বরকে লাভ করিলেন। ধ্রুব শিশু হইলেও তাঁহাকে পরীক্ষায় পতিত হইতে হইয়াছিল, যখন তিনি সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ধ্রুবচরিত্র পাঠ করিলে সাধনের আবশ্যকতা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ব্রাহ্মদিগের কোন লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্র নাই, অতএব তাঁহাদের আরও অধিক সাধনের প্রয়োজন। পুস্তক নাই বলিয়া অধিক সাধুসংসর্গ এবং অধিক আলোচনার আবশ্যক। সাধন না করিলে অন্তর প্রস্ফুটিত হয় না। সাধন, তপস্যা, অতি গুরুতর বিষয়, বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক, আত্মার গভীর স্থানে এ সকল

* শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

নিগূঢ় ব্যাপার সাধন করিতে হয়। উচ্চ সাধন বাহিরের ঘটনা নহে। অতএব সাধন সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে। প্রথমতঃ অধিকার অনুসারে সাধন করিবে। বর্ণপরিচয় অধ্যয়ন না করিয়া মহাভারত পাঠ করা অনধিকার চর্চ্চা। বর্ণপরিচয় অভ্যাস করিতে গিয়া, যদি বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে ব্যাকুল হই, কদাচ আমাদের ব্যাকুলতা পূর্ণ হইবে না। ঈশ্বরের নাম শ্রবণমাত্র প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে প্রেম উদ্বেলিত হয়, আমিও কল্পনা দ্বারা মনে করিলাম, আমার ঈশ্বর দর্শন হইল; কিন্তু এইরূপ হয়, এক বৎসর কিম্বা দশ বৎসর আত্ম-প্রতারণা করিতে পারি, অবশেষে এক দিন এই অসত্য প্রকাশিত হইবেই হইবে। তখন মনে করিব আমি যেমন প্রতারিত হইয়াছি, ঐ ব্যক্তিও সেইরূপ প্রতারিত হইতেছে। এইরূপ অনধিকার চর্চ্চা দ্বারা ব্রাহ্মগণ আপনাদের এবং অন্যের অনিষ্ট করিয়া থাকেন। কেন না যত দিন পর্য্যন্ত আমরা আপনারা প্রকৃত বিষয় লাভ করিতে না পারি, তত দিন যাঁহারা যথার্থ বিশ্বাসী এবং ভক্ত তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত নহে। এইরূপ ব্যবহারকেই অনধিকার চর্চ্চা বলে।

[সাধনের তিনটী অঙ্গ,]

১ম। জ্ঞান,

২য়। প্রেম,

৩য়। কার্য্য,

১ম। জ্ঞান, দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) পরা বিদ্যা এবং (খ) অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা লাভ করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে সহজ জ্ঞান ও বিবেক দান করিয়াছেন, এবং এ সকল ভিন্ন আমাদিগকে স্ব চিন্তা সাধন, উৎকৃষ্ট আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ, সাধু সংসর্গ এবং ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতে হইবে। এ সকল সাধন দ্বারা ধর্ম্মচিন্তা-শক্তি এতদূর বলবতী করিতে হইবে যে, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি ঈশ্বর এবং ধর্ম্মবিষয় চিন্তা করিতে পারিব। (খ) অপরা বিদ্যা, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা করা। এ দুই অঙ্গকে যত্নপূর্ব্বক সাধন করিতে হইবে।

২য়। প্রেম সাধনও দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) ঈশ্বরের প্রতি (খ) মনুষ্যের প্রতি। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রগাঢ়তর করিবার জন্য তাঁহার প্রেমিক ভক্তদিগের উপাসনায় যোগ দিতে হইবে। সেই সকল সঙ্গীত করিতে হইবে, যাহা দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রস্ফুটিত হয়। যেমন ঈশ্বরকে প্রেম দিব, তেমনই

মনুষ্যদিগকে, তাঁহার সন্তানদিগকে ভালবাসিব। জনসমাজে যথার্থ নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম-জনিত প্রেম আছে কি না সন্দেহ। যে প্রেমের সঙ্গে কোন বিশেষ মত, কিম্বা সাংসারিক কোন ভাবের যোগ আছে তাহা উৎকৃষ্ট নহে। যদি কাহারও প্রতি অপ্রণয় কিম্বা অশ্রদ্ধা থাকে, তবে তাহার গুণগুলি স্মরণ করিয়া একটী কাগজে লিখিয়া তাহা বারম্বার পাঠ করিব, উপাসনার সময় তাহাকে শ্রদ্ধা করিবার জন্য, জীবন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রতিদিন প্রার্থনা করিতে হইবে এবং অন্যান্য সময়োপযুক্ত উদ্ভাবিত উপায় অবলম্বন করিয়া সকলকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু গুণ দেখিয়া ভালবাসাও উৎকৃষ্ট নহে। কোন আত্মীয় ব্যক্তির সন্তানকে দেখিবামাত্র ভালবাসি,—তাহার গুণের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। তেমনই ঈশ্বরের সন্তান বলিয়াই ভালবাসিব, এক পিতার পুত্র, এক দেবতার উপাসক, এক গুরুর শিষ্য, এই মধুর সম্পর্কেই ভালবাসিতে হইবে। এ সম্পর্কে সগুণ নির্গুণের প্রভেদ নাই। এই ভালবাসার সাধন।

৩য়। কার্য্যসাধন, ধর্ম্মের আদিষ্ট কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলে হয়ত পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি নানা প্রকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে হইবে। এ সমস্ত অবস্থাতে দৃঢ়সঙ্কল্প চাই। যদি দ্বীপান্তরিত হইতে হয়, কিম্বা যদি প্রাণ যায়, তথাপি সত্য পালন করিতেই হইবে। ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইলে সচ্চরিত্র হইতে হইবে। লোকে জানুক আর না জানুক, আমি জানি, আমি কোন্ দোষে দোষী। একটী ব্রাহ্মের চরিত্রের দ্বারাও যদি ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হয়, সে ব্রাহ্ম বিশ্বাসঘাতক।

সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এই দুইটী ব্রাহ্মজীবনের প্রধান লক্ষণ। যে ব্রাহ্ম এই লক্ষণ হইতে বিচ্যুত, তিনি ব্রাহ্মসমাজের কলঙ্ক; অতএব প্রাণপণে সচ্চরিত্র থাকিবে।

যে উপাসনা দ্বারা অন্তরে মধুরতা, প্রেম শান্তি লাভ করা যায়, সেই উপাসনা সাধন করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা ঈশ্বরকে আয়ত্ত করিতে হইবে। জগতে জ্ঞান কৌশলের চিহ্ন দেখা যায়, অতএব ইহার একজন জ্ঞানময় স্রষ্টা আছেন, এইরূপ অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা নিরূপণ করিলে হইবে না। লোকের উপকার করেন, অতএব ঈশ্বর দয়াময়, এরূপ যুক্তির উপরে নির্ভর করিলে মরিতে হইবে। যিনি জগতের বিধাতা তিনি নিরাকার। কিন্তু তাঁহার আকার নাই বলিয়া কি তাঁহার দর্শন করা যায় না? সাধন দ্বারা তাঁহাকে উজ্জ্বলরূপে প্রত্যক্ষ

করা যায়। ইহা কল্পনা, কিম্বা অলঙ্কারের কথা নহে। জ্ঞানময় প্রেমময় পবিত্র ঈশ্বর অন্তরে বর্ত্তমান, দর্শন করিলে আর অবিশ্বাসী হইতে পারি না। বরং জগতের আর সকল বস্তু অসৎ হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে দেখিলাম, এই সত্য ঘটনাকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। যে সকল উপায় দ্বারা ভক্ত সাধক তাঁহার নিকট গমন করিয়াছেন, সে সমুদয় সাধন করিতে হইবে। তাঁহার নামের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। দয়াময় প্রেমসিন্ধু অধমতারণ ইত্যাদি নাম সাধন, কিম্বা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার প্রেমে মন বিগলিত হইবে। ইহা পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ সত্য, তিনি এবং তাঁহার নাম একই পদার্থ। দয়াময় বলিবা মাত্র অক্ষর মনে আসিবে না; কিন্তু তাঁহাকেই দেখিব। যতক্ষণ অন্তরের মধ্যে তাঁহাকে না লাভ করিতে পারিব, ততক্ষণ ধ্যান পরিত্যাগ করিব না। ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকিব। তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার প্রেমে হৃদয় পূর্ণ থাকিবে। প্রত্যহ উপাসনা সাধন করিতে হইবে। তাঁহাকে না দেখিলে কিরূপে তাঁহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে? আমাদের ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য মহাশয় সাধনের একটী দৃষ্টান্ত। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে, ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্গতি থাকিত না। সাধন ভিন্ন ব্রাহ্মজীবন অসার এবং নিষ্প্রভ। যখন সাধন দ্বারা ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র উজ্জ্বলরূপে দেখিবে, তখন পাপ করা অসম্ভব হইবে।

ভক্তির ধর্ম্ম।*

রবিবার, ২৯শে কার্ত্তিক, ১৭৯৭ শক ;

১৪ই নবেম্বর, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ধর্ম্মের নানা প্রকার উচ্চতর সত্য, নানা প্রকার মতামত এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি আছে ; তাহা অবগত হইলে, ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু সে সকল ভক্তি ও প্রেম শূন্য হইলে প্রাণহীন হইয়া থাকে। যতদিন ভক্তিরসামৃত হৃদয়কে বিগলিত না করে, ততদিন ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। সঙ্গীত পুস্তক হইতে একটী সঙ্গীত পাঠ করিলে, তদ্দ্বারা হৃদয়ে প্রীতি জন্মে না। সঙ্গীতের প্রাণ সুর। তান লয় মিশ্রিত হইলে সঙ্গীতের আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন সঙ্গীতের শব্দে তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না, তেমনই ভক্তি প্রেম রূপ সুর স্বর বিহীন ধর্ম্মতত্ত্বের কোন আস্বাদন পাওয়া যায় না। ভক্তিরস মিশ্রিত ধর্ম্ম অন্তরের তারে সংলগ্ন হইলে মধুর ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। সেই ভক্তি আমরা কিরূপে লাভ করিব ? যে ভক্তি না হইলে ঈশ্বরকে দেখা যায় না, তাহা আমরা কোথায় পাইব ? ভক্তিহীন জীবন এবং ধর্ম্ম নীরস। ভক্তিরস যখন ধর্ম্মের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখন তাহা সরস হয়। বৃক্ষের নিম্নে যেমন রস সঞ্চিত থাকিলে তাহা ফল ফুলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে এবং রস না থাকিলে তাহা যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনই ভক্তিরসহীন ধর্ম্ম নিতান্ত নিষ্ফল। কেবল শুষ্ক মত এবং জ্ঞানে মনুষ্যের মন সন্তুষ্ট হইতে পারে না। যে ভক্তির জন্য অন্তঃকরণ অত্যন্ত লালায়িত এবং তৃষিত তাহা কোথায় পাইব ? শুনিয়াছি মহাত্মা চৈতন্যের মন যখন ভক্তি বিরহে ব্যাকুল হয়, তখন তিনি দীন বেশে প্রাচীন সাধকদিগের সেবা করিয়াছিলেন। সাধুদিগের আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিয়া এবং নানা প্রকারে তাঁহাদের সেবা বন্দনা করিয়া তিনি ভক্তি শিক্ষা করেন। এইরূপে যখন সাধুসেবা দ্বারা তাঁহার অন্তরে ভক্তি জন্মিল, তখন সেই বেগ আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি দেশ দেশান্তরে হরিনাম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মত ব্যাকুল হইয়া সাধুসেবা না করিলে আমরা ভক্তি পাইব না। এজন্য জ্ঞানাভিমান ও অহঙ্কার ছাড়িতে হইবে। আমাদের যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট এই অভিমানেই আমাদিগকে ভক্তি হইতে দূরে রাখিয়াছে। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই যদি

---

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

আমরা ভক্তির জন্য লালায়িত হইয়া থাকি, তবে লজ্জা অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। সাধুসেবা দ্বারা ভক্তি শিক্ষা করিব তাহাতে আর অপমান কি? ভক্তেরা যেরূপে ভক্তি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। ভক্ত চিনিব কিরূপে? সে বিষয়েতেও চৈতন্য বলিয়াছেন, যাহাকে দেখিলে প্রেমে হৃদয় বিগলিত হয়, তাঁহাকেই ভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্তের আর এক ক্ষমতা এই, তাঁহাকে দেখিলে স্বর্গীয় ভাব অনুভূত হয়। যাঁহাকে দেখিলে ভক্তি হয় তিনিই ভক্ত। তাঁহার নিকট ভক্তি ভিক্ষা করিতে যতদিন লজ্জা বা অপমান বোধ থাকিবে, ততদিন কিছুই হইবে না। অতএব বিনীত ভাবে ভক্তের নিকট ভক্তি ভিক্ষা কর। চৈতন্য যাহা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাহা না করিলে হৃদয়ের শুষ্কতা যাইবে না। আমাদের যেরূপ দুর্দ্দশা কষ্ট, যদি এইরূপে থাকিতে হয়, তবে জীবন ধারণে আর কাজ কি? ভক্তদিগের আশীর্ব্বাদে যদি ভক্তি পাই, তবে বাঁচিব নতুবা আমাদের যন্ত্রণার শেষ নাই। যদি যন্ত্রণায় মরিতে হইল তবে আর অভিমানে প্রয়োজন নাই, এস আমরা ভক্তের পদতলে বসিয়া ভক্তি করি। যেখানে যিনি ভক্ত আছেন সেইখানে তাঁহার নিকট যাইব। ভক্তের মুখে ভক্তবৎসলের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদাদি যেরূপ ভক্তি লাভ করিয়াছেন, আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। আর একজন ভক্ত বলিয়াছেন, জল যেমন নিম্নদিকে গমন করে তেমনই বিনম্র হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। কোন প্রকার গর্ব্ব থাকিবে না, ভক্তের নিকট ভক্তি ভিক্ষা করিতে অহঙ্কার যেন স্থান না পায়। অহঙ্কারেই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ভক্তিহীন অহঙ্কারী যথার্থ ধর্ম্ম হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করে। এ প্রকার জীবনে কিছুমাত্র সুখ নাই। অতএব তৃণের ন্যায় এস সকলে বিনীত হইয়া ভক্তি ভিক্ষা করি। ইহা ব্যতীত জীবন বৃথা। ভক্তি বিনা ভক্তবৎসলের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাকে না দেখিতে পাই তবে আর কি হইল? এইরূপে ভক্তি লভ্য হইলে তাহা আর একস্থানে বদ্ধ থাকিবে না। চৈতন্যের জীবনে যেমন হইয়াছিল তেমনই হইবে। ভক্তি প্রবাহিত হইয়া চারিদিকে প্রচারিত হইবে। দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে সেই ভক্তি দান করুন। তাঁহার জন্য, ভক্তির জন্য, চল আমরা ভক্তের নিকট গমন করি।

নাম সঙ্কীর্ত্তন ও প্রকৃতভক্তি।*

রবিবার, ১০ই মাঘ, ১৭৯৭ শক ;
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে একটী আখ্যায়িকা লেখা আছে। একদিন চৈতন্য প্রেমোন্মত্ত হইয়া ভক্তদিগের সঙ্গে হরিনাম গান করিতেছিলেন। নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তি উদ্বেলিত হইয়া পড়িল, তিনি এক কালে অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার শরীর ধূলায় ধূসরিত হইল। সেই প্রেম কি সামান্য প্রেম? কখনও তাঁহার অশ্রুপাত হইতে লাগিল, কখনও তাঁহার সমস্ত শরীর বিকম্পিত হইতে লাগিল, কখনও রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। সেই স্থানে এক মহাপুরুষ উপস্থিত ছিলেন, তিনি চৈতন্যের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আর এক ব্যক্তি দেখিল, ভূমিতে পড়িয়া যদি নৃত্য করা যায়, লোকের নিকট সম্মান পাওয়া যায়। এই ভাবিয়া সে ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ তাহার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। সে বলিল, তুমি চৈতন্যের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলে, আমাকে কেন প্রহার করিতেছ? সেই মহাপুরুষ বলিলেন, তুমি কপট, তোমার অন্তরে প্রেম নাই, ভক্তি নাই, তুমি কেবল দেখাইবার জন্য এই কপট ব্যবহার করিতেছ; অতএব তোমার প্রবঞ্চনার শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তবিক জগতের অনেক স্থানেই এই প্রকার কপট ব্যবহার দেখা যায়। চৈতন্যের অকৃত্রিম স্বাভাবিক ভক্তি। সেই প্রকার ভক্তিতে যদি হৃদয় উদ্বেলিত না হয়, অথচ যে ব্যক্তি বাহিরে সে প্রকার ভাব দেখায়, নিশ্চয়ই সে নিন্দনীয় ব্যক্তি। চৈতন্য বলিতেন, একবার হরি নাম গান কর, সকল পাপ তাপ ধৌত হইয়া যাইবে। তিনি নিশ্চয় জানিতেন, নাম এবং ঈশ্বর অভিন্ন, একবার ভক্তির সহিত যে ব্যক্তি সে নাম গ্রহণ করে, সে পরিত্রাণ পায়; এইজন্য নিঃসংশয় চিত্তে তিনি এই কথা বলিতেন। তাঁহার মুখে হরিনাম শ্রবণ মাত্র জগতের কত লোক

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে। তিনি ভক্তির সহিত সে নাম গ্রহণ করিতেন। ভক্তির সহিত প্রভুর নাম কীর্ত্তন এবং শ্রবণ করিলে, বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েরই এই পরিত্রাণ লাভ হয়। বৃথা নাম উচ্চারণ করিলে নামাপরাধ হয়। নামের গুণে পরিত্রাণ পাইব, এই বিশ্বাসে ঈশ্বরের নাম গান করিতে হইবে। এই যে আমরা নাম গান করিলাম, এই নাম উচ্চারণে আমরা পরিত্রাণ পাইব, এই প্রকার বিশ্বাস চাই। যে বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ করে, সেও পরিত্রাণ পাইবে। অতএব সকলে সাবধান হইয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবেন। অনেকে বলেন, এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আমাদের মন পবিত্র হইল, ইহা ভক্তির কথা সন্দেহ নাই। মূলে যদি বিশ্বাস থাকে, নাম শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই হৃদয় পবিত্র হইবে। সুস্বরে নাম গান করুন আর না করুন, নাম শ্রবণ মাত্রেই ভক্তের প্রেম উথলিয়া উঠিবে। সুমিষ্ট স্বর পরিত্রাণ দিতে পারে না, একমাত্র ঈশ্বরের সুমধুর নামই আমাদের পরিত্রাণের উপায়। বিশ্বাস ভক্তির সহিত সেই নাম গ্রহণ করিলেই আমরা মুক্তি পাইব। ভক্তির সহিত সেই মধুর নাম উচ্চারণ করিলে, ভক্তিভাবে সেই নামের সৌন্দর্য্যে ডুবিলে, মনুষ্য স্থির থাকিতে পারে না। সে নামের মধুরতা আস্বাদ করিলেই মন উন্মত্ত হয়। এইজন্যই জগতে কেবল হরিনাম বিস্তার করিবার জন্য, চৈতন্য প্রেমোন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেন। ভক্ত বিশ্বাস করেন, একবার যদি এই মধুর নাম কাহাকেও বলিতে পারি, জগতের লোক পরিত্রাণ পাইবে। সেই নাম বিস্তার করিবার জন্য আমরাও উন্মত্ত হইব। নামের এমন ক্ষমতা আছে যে, ভক্তির সহিত গ্রহণ করিলে তাহা মনকে উন্মত্ত করে। এইরূপে যদি নামের সাধনা করিতে পারি, আমরাও সেইরূপ কৃতকার্য্য হইব। নামে যদি আমাদের তেমনি ভক্তি না হয়, আমরা জগতের কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিব না। কেবল এই অবিশ্বাসী ভক্তিরসশূন্য জিহ্বা দ্বারা সেই পবিত্র নামের অগৌরব হইবে। অতএব বন্ধুগণ! সাবধান, অবিশ্বাস, অভক্তির সহিত এই নাম গান করিও না। বিন্দুমাত্রও যদি নামের মধুরতা আস্বাদ করি, তবে নাম গান করিতে পারি। এইজন্য সকলেরই নাম সাধন করিতে হইবে। যতক্ষণ নামরসে মন মত্ত না হইবে, যতক্ষণ নামের সৌন্দর্য্যে প্রাণ নিমগ্ন না হইবে, ততক্ষণ ব্যাকুলতার সহিত এই নাম সাধন করিব, কিছুতেই বিরত হইব না। নামের মহিমা বুঝিলে জীবন কৃতার্থ হইবে। ঘোর মহাপাতকী আমরা, সেই মধুর দয়াময় নামে আমাদের রুচি কই? আমরা

পাপে অসাড় হইয়াছি, একবার যদি বিশ্বাস ভক্তির সহিত দয়াময় নাম করিতে পারি, পরিত্রাণ পাইব। এই নাম আমাদের জীবন মরণের সহায়। যখন মৃত্যুকাল আসিবে, তখন কি বেদ, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ আমরা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব? যখন দেখিব, পাপের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি, তখন কি উপদেষ্টার উপদেশ শুনিলে অন্তরের অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে? সেই বিপদের সময় নাম ভিন্ন আর গতি নাই। তখন সেই নাম যদি আমাদের সম্বল থাকে, আমাদের আর দুঃখ থাকিবে না। একবার নাম ধরিয়া প্রভুকে ডাকিলাম, আর তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল। যদি নিজে এই নাম ভুলিয়া যাই, তখন বন্ধুগণ এই নাম বলিয়া দিলেও পরিত্রাণ পাইব। এই নামে আমরা পরিত্রাণ পাইব, আবার ইহাতে ভারতবর্ষের সমুদয় লোক পরিত্রাণ পাইবে। এই নাম সামান্য বস্তু নহে, এই নাম অবহেলা করিও না। এই ব্রহ্মমন্দিরে দেখিয়াছি ব্রহ্মনাম হইতেছে, কেহ অন্যমনস্ক হইলেন, কেহ নিদ্রিত হইলেন। কেন এই দুর্দ্দশা? নামে ভক্তি না হওয়াই ইহার কারণ। চৈতন্য বলিয়াছেন, কেহ যদি আলস্যের সহিত ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করে, সে নামের অপমান করে। যদি নামে ভক্তি না থাকে, অভক্তির সহিত সেই নাম শ্রবণ করিওনা। যত প্রকার পাপ থাকুক না কেন, একবার ভক্তির সহিত যে নাম গ্রহণ করিলে মনুষ্য পরিত্রাণ পায়, সেই নামে অবহেলা করিও না। যতই ভক্তির সহিত এই নাম গ্রহণ করিবে, ততই বুঝিতে পারিবে, এই নামে কত মধুরতা। যদি অহৈতুকী ভক্তির সহিত এই নাম উচ্চারণ করিতে পার, সকল পাপ তাপ চলিয়া যাইবে। এই নাম আমাদের জীবন মরণের একমাত্র সম্বল। দয়াময় নাম মহাপাপীর সম্বল। সেই নামের মধ্যে ঈশ্বর। নামেতে আর তাঁহাতে ভিন্নতা নাই। নামেতে বিশ্বাসী হই। নামরসে উন্মত্ত হইয়া, নামের মহিমা জগতের লোককে দেখাইয়া, আমরা কৃতার্থ হই।

নামের মহিমা।*

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৯ই মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কি করিলাম? এতকাল অতিবাহিত হইল; কিন্তু জীবনে কি সম্বল সঞ্চিত হইল? পূর্ব্বে যে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপীড়িত হইতাম, এখনও সে সকল ইন্দ্রিয় শরীর মনকে কলঙ্কিত করিতেছে। আর ত বিলম্ব নাই। মৃত্যুও অপেক্ষা করিবে না। বয়স ত শেষ হইয়া আসিল। কি কার্য্য করিলাম সংসারে? ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া অদ্বিতীয় ত্রিভুনপতি পরব্রহ্মের উপাসনা শ্রবণ করিলাম, সেই বিশুদ্ধ উপাসনাপ্রণালী গ্রহণ করিলাম, মনে করিয়াছিলাম ইহা দ্বারা বিশুদ্ধ হইব; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইতে পারি নাই, এখনও যে সংসারের সুখাসক্তি মনকে আক্রমণ করে। এখনও যে ভক্তিভাবে তাঁহার নাম গান করিব এবং তাঁহার গান করিতে করিতে মন প্রেমে বিগলিত হইবে, সে ভাব হয় নাই। কেন সেই ভাব উদয় হয় না? কেন হয় না? ঘোরদর্শন সেই অহঙ্কার-রিপু প্রাণমধ্যে অবস্থান করিয়া সকল আশা ভরসাকে দূর করিয়া দিতেছে। ভক্তদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহাদের জীবনে পাঠ করিয়াছি, জীবনকে তৃণের মত করিতে না পারিলে তাঁহার নামে মতি হয় না, তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র হওয়া যায় না; কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও সেইরূপ হইতে পারিতেছি না। কতবার মনে করি, তাঁহার পদতলে পড়িয়া থাকিব, মনে করি, মনুষ্য যদি আমাকে কটু বলে, আমি তাঁহার পদ চুম্বন করিব; কিন্তু কার্য্যের সময় সে প্রতিজ্ঞা থাকে না। অহঙ্কারী মন কিছুতেই বশীভূত হয় না। এইরূপে জীবন চলিয়া গেল। এই প্রার্থনা মনে, প্রেমময়ের নাম কীর্ত্তন করিব, সেই মধুর হরিনামে প্রাণ কৃতার্থ হইবে, সেই নামে কত মহাপাপী পরিত্রাণ পাইয়াছে; কিন্তু এই অধম জীবনে সেই নামের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইল না। নামের মধ্যে যদি সেই প্রচুর সৌন্দর্য্য দেখিতে না পাই, তবে কিরূপে তাঁহার পদাশ্রয় পাইব? অহঙ্কারী উদ্ধত ব্যক্তি কিরূপে তাঁহাকে পাইবে? আমার

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

পক্ষে সেই নামই সার। ভজন সাধন ভাল জানি না। ভক্তিভাবে তাঁহার নাম করিব। তাঁহার নাম গ্রহণ করিতে করিতে প্রেমে বিগলিত হইব এই আমার আশা, ইহাতেই আমার গতি। যাঁহারা সাধন ভজন এবং যোগ তপস্যা করিয়া প্রভুর প্রেমে মগ্ন হন, তাঁহারা ধন্য! কিন্তু আমার ন্যায় নরাধম যাহার একবার ভক্তিভাবে নাম গ্রহণ করিতেও সময় হয় না, তাহার কি গতি হইবে? আর ত বিলম্ব নাই। এখন যাহাতে সেই নামটী সার করিতে পারি, সেই নামরসে বিগলিত হইতে পারি, এই প্রার্থনা। এখন ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বাস্তবিক মাটির ন্যায়, ধূলির ন্যায় হইয়া তাঁহার ভক্তদিগের চরণতলে বসিতে পারি। শুষ্ক ধর্ম্মের মত, কর্ম্মানুষ্ঠান, সংসারের সভ্যতা প্রাণকে তুষ্ট করিতে পারে না, তাহার মধ্যে শান্তি নাই। নির্জ্জনে বসিয়া কেবল প্রভুর নাম করিব। যাঁহারা সভ্যতা বিস্তার করিতে চান করুন; কিন্তু দয়াময় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার নামে রতি ভিন্ন প্রেম হয় না। আর অধিক এই বিষয়ে কি বলিব? অদ্য অপরাহ্নে যে নাম কীর্ত্তন হইবে, তাহাতে যেন ভক্তিভাবে যোগ দিতে পারি। তাহা হইলে সেই নামে প্রাণ মন শুদ্ধ এবং সুশীতল হইবে। সকল পাপ তাপ এবং দুঃখ যন্ত্রণা চলিয়া যাইবে। ভক্তিভাবে দয়াময়ের নামরসে মগ্ন হইয়া থাকিব, এখন ইহাই যেন জীবনের সার হয়। আর যেন জীবনকে অবহেলা না করি। প্রতিদিন ভক্তিভাবে যেন নাম গান করিতে পারি। সেই চিরশান্তির অবস্থায় যেন সুখে বাস করিতে পারি।

ভক্তি সাধন।*

বৃহস্পতিবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

পুরাণে লিখিত আছে, এক দিবস, মহর্ষি বেদব্যাস দীনভাবে দুঃখিত চিত্তে স্বীয় আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে আগমন করিলেন। বেদব্যাস নারদকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! আমার চিত্ত কিছুতেই সুপ্রসন্ন হইতেছে না, আমার চিত্তকে সর্ব্বদাই অসুস্থ বোধ করিতেছি। আমি শ্রুতশীল, মেধাবী, ব্রতধারী, যাজ্ঞিক এবং তপস্বী, তবে আমার চিত্ত অসুস্থ হইল কেন? বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন, মহর্ষে! আপনি বেদ চতুষ্টয়কে বিভক্ত করিয়াছেন, অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছেন, আপনার রচিত মহাভারতে মনুষ্যের জ্ঞাতব্য সমস্ত নীতি ধর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়, মনুষ্য শোক মোহ হইতে মুক্ত হইয়া প্রেমানন্দ উপভোগ করে, আপনি তদ্বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

এই নববিধ উপায় দ্বারা ভগবান্ হরির সেবা করিতে করিতে জীবগণের হৃদয়ক্ষেত্রে ভগবদ্ভক্তি-বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হয়। নবাঙ্গযুক্ত সাধনরূপ বারি দ্বারা ভক্তিবৃক্ষ যতই অভিষিক্ত হয়, সেই পরিমাণে উহা শাখা প্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া ভগবদ্দর্শনরূপ অমূল্য ফল প্রদান দ্বারা সাধকের হৃদয়কে সুপ্রসন্ন করে। অতএব আপনি ভগবান্ হরির গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হউন। আপনার চিত্তব্যাপি দূরীভূত হইবে। মহর্ষি বেদব্যাস দেবর্ষি নারদের উপদেশানুরূপ কার্য্য করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এই উপাখ্যানের মধ্যে দুইটী ভাব গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। প্রথমতঃ ভক্তি বিনা মনুষ্য শান্তি লাভে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়তঃ গুরূপদেশ ও সাধন ভিন্ন সাধারণ নর নারীর অন্তরে ভক্তির উদয় হয় না।

বেদব্যাস যেরূপ ভক্তিহীন অবস্থায় শান্তিসুখ সম্ভোগে সক্ষম হন নাই,

* সাধন কাননে শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগেরও সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে নানা প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছেন, পৌত্তলিকতার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন, সময়ে সময়ে উপাসনাও করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন নহে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, হে ব্রাহ্ম! তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছ কি না? ব্রাহ্ম যদি সত্য কথা বলেন, তাহা হইলে তিনি বলিবেন, না। ব্রাহ্মগণ উপাসনা কালে যে সাময়িক অল্প মাত্র আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, তাহাকে শান্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না। যাহা দ্বারা সমস্ত জীবন, পাপ, তাপ, শোক, মোহ প্রভৃতি অধর্ম্ম হইতে মুক্ত থাকিয়া সুখে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাকেই শান্তি বলিয়া গণ্য করা যায়। ভক্তিদেবীর অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে প্রকৃত শান্তি উপলব্ধ হয় না।

কতকগুলি ব্রাহ্ম মনে করেন, জ্ঞানী পণ্ডিতগণ ভক্তিকে প্রশংসা করেন না। নীচ বংশীয় এবং মূর্খেরাই ভক্তিকে সমাদর করিয়া থাকে। আধুনিক বৈষ্ণব-দিগকে দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা উক্ত বাক্যের প্রমাণ প্রদর্শন করেন। আমি তাঁহাদিগের যুক্তি স্বীকার করিতে পারি না। পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখা যায়, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, দেবর্ষি নারদ, রাজর্ষি অম্বরীষ, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির এবং মহর্ষি পর্ব্বত প্রভৃতি মহাত্মাগণ পরম ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, অথচ ইঁহারা সকলেই জ্ঞানী ও সদ্বংশসম্ভূত। প্রেমিক চূড়ামণি মহাত্মা চৈতন্য একজন জ্ঞানী হইয়াও প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষকে ভক্তিস্রোতে প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। পুরীবাসী বিখ্যাত বৈদান্তিক মায়াবাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের শিষ্য হইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম প্রথমে চৈতন্যকে অবজ্ঞা করিতেন। তদ্বিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

সার্ব্বভৌম কহে ইহার নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতীসম্প্রদায় এই হয়েন মধ্যম॥
গোপীনাথ কহে ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায় নাহিক অপেক্ষা॥
ভট্টাচার্য্য কহে ইহার পৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হবেক রক্ষণ॥
নিরন্তর ইহাকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাব॥

কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দুঁহে দুঃখী হৈলা। ইত্যাদি।

পরে চৈতন্যের সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার প্রেমোন্মত্ততা দেখিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহার শিষ্য হইয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

দেখি সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি পড়ি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥
প্রভুর কৃপায় তার স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম প্রেম দান আর বর্ণের মহত্ত্ব॥
শত শ্লোক কৈল দণ্ড এক না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে॥
শুনি সুখে প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন॥
অশ্রু স্তম্ভ পুলক স্বেদ কম্প থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি॥

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধি র্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

এইরূপ বিবিধ শ্লোক দ্বারা সার্ব্বভৌম চৈতন্যের স্তব করিয়াছিলেন।

ভারতের একমাত্র পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ প্রবোধানন্দ সরস্বতী, যিনি বেদান্ত তর্ক, সাঙ্খ্য, বৈশেষিক জ্ঞান, মীমাংসা আগম নিগম, মহাপুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র অলঙ্কার কাব্য নাটকাদির রহস্য সিদ্ধান্ত বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা দ্বারা কাশীবাসী বহুসংখ্যক ছাত্রগণের আনন্দপদ্ম প্রফুল্ল করিতেন, এবং মায়াবাদী দণ্ডীদিগের সর্ব্বপ্রধান আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে চৈতন্যকে অত্যন্ত নিন্দা করিতেন, পরে চৈতন্যের প্রেমস্রোতে ভাসমান হইয়া তাঁহার শিষ্যপদে অভিষিক্তপূর্ব্বক যেরূপ ভক্তিভাবে চৈতন্যকে স্তব করিয়াছিলেন, চৈতন্যচন্দ্রামৃত হইতে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি :—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে, বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥"
"নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধিচন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশুহাসিনে ॥"
"উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডৌ
বাহূ প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষম্।
বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরিহরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ-
র্ব্বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রম্ ॥"
"আনন্দলীলাময়বিগ্রহায়, হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥"

এই দুই জন ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক জ্ঞানী পণ্ডিত চৈতন্যের শিষ্য হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার প্রায় সমস্ত শিষ্যই পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদিগের কতিপয়ের নাম উল্লেখ করিতেছি। অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, বিদ্যানিধি আচার্য্য, গদাধর পণ্ডিত, আচার্য্য রত্ন, পুরন্দর পণ্ডিত, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, নারায়ণ পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, হরিভট্ট, শ্রীনৃসিংহানন্দ, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীকান্তনারায়ণ, বল্লভ সেন, সত্যরাজ খান, মুকুন্দ দাস, শ্রীরঘুনন্দন ইত্যাদি।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ভক্তির প্রতিকূল নহে বরং অনুকূল। কিন্তু ভক্তগণ জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকেই অধিক সমাদর করিয়া থাকেন। কারণ, জ্ঞানে অহঙ্কার হয়, অহঙ্কার ভক্তির পরম শত্রু। হৃদয় নিম্ন না হইলে ভক্তিস্রোত তাহাতে প্রবাহিত হয় না। জলের গতি নিম্নদিকেই হইয়া থাকে, উচ্চদিকে নহে। মহাত্মা চৈতন্য শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন যে, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥" ভক্তগণ, সিংহ ব্যাঘ্র অপেক্ষাও অহঙ্কারকে অধিক ভয় করিয়া থাকেন। জ্ঞানীগণ অহঙ্কারকে স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষার উপায় মনে করিয়া থাকেন। অধিক কি প্রেমিক চৈতন্যও ভক্তিলাভের পূর্ব্বে জ্ঞান প্রভাবে অত্যন্ত

অহঙ্কারী ছিলেন। বিশেষতঃ ভক্তগণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কখন হাস্য করেন, কখন ক্রন্দন করেন, কখন নৃত্য করেন, কখন উর্দ্ধে লম্ফ দিয়া আস্ফালন করিতে থাকেন, কখন মূর্চ্ছিত হন। এই সমস্ত প্রেমবিকার জ্ঞানীদিগের নিকট উপহাসের বিষয়। প্রবোধানন্দ স্বরস্বতী যে সময়ে চৈতন্যের বিদ্বেষী ছিলেন, সে সময়ে তিনি চৈতন্যের উন্মত্ততা দেখিয়া অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। বিশেষতঃ জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানী না হইলে ধাম্মিক হওয়া যায় না। ভক্তগণ এ কথায় সম্পূর্ণরূপে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন। একজন নিরক্ষর মূর্খ ঈশ্বরানুগ্রহে ভক্তিলাভ করিয়া দেবতাদিগেরও পূজনীয় হইতে পারেন। অতএব ভক্তি জ্ঞান-সাপেক্ষ নহে।

অধিকাংশ ব্রাহ্মের এইরূপ সংস্কার যে, ধর্ম্ম সহজজ্ঞানমূলক, সুতরাং তাহা আর শিক্ষা করিতে হয় না। এই সংস্কারবশতঃ ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে না। কৃষি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সংসারের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই শিক্ষণীয়, শিক্ষা ভিন্ন কোন বিষয়েরই উন্নতি হয় না; কিন্তু ধর্ম্ম শিক্ষণীয় নহে, ইহা কিরূপে ব্রাহ্মগণ স্বীকার করেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মশিক্ষা প্রচলিত না থাকাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকলেই সমান। যিনি বিংশতি বৎসর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত একজন নব্য ব্রাহ্মের কিছুমাত্র ভিন্নতা স্বীকার করা হয় না। এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষার অভাবেই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিস্রোত অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ধর্ম্মও শিক্ষণীয় বিষয়। উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া মনুষ্যজীবনকে সফল করিতে হইবে। ঈশ্বরপ্রসাদে প্রায় এক বর্ষ কাল হইতে ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মশিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই অল্প কালেই ধর্ম্মশিক্ষার উপকারিতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

চিত্তের প্রসন্নতা।*

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৮ই মাঘ, ১৭৯৯ শক ;
২০শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

পুরাণে একটী আখ্যায়িকা আছে, একজন রাজা অনেক প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান, অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ করিতেন। একদিনও তিনি নিত্য কর্ম্ম পালনে বিরত হইতেন না। তাঁহার নিকটে দিগ্‌দিগন্ত হইতে দেবর্ষি, মহর্ষি, সন্ন্যাসী, বৈরাগী সকল আসিতেন। রাজার বিশ্বাস ছিল ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মা বিশুদ্ধ হয়, মন প্রসন্ন হয়। কিন্তু বহুকাল পর তাঁহার মনে একটী প্রশ্নের উদয় হইল। তিনি মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলাম, এত প্রকার ব্রত উদযাপন করিলাম, নানা প্রকার কঠোর সাধন করিয়া যে মন আমাকে তাহার আজ্ঞাবর্ত্তী করিত, সে মনকে আমার বশীভূত করিলাম, তথাপি কেন আমার মন প্রসন্ন হইল না? যাজ্ঞিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদিগের আদিষ্ট সমস্ত যজ্ঞ এবং ব্রতাদি পালন করিলাম, তথাপি চিত্তের প্রসন্নতা হয় না কেন? তাঁহারা বলিলেন আরও এরূপ কার্য্য কর; কিন্তু বারম্বার ঐ সকল অনুষ্ঠান করিয়াও তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না। এই অবস্থায় একদিন দেবর্ষি নারদ হরিগুণ গান করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। নারদ ব্রত-পরায়ণ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এরূপ বিমর্ষ কেন? রাজা বলিলেন, আমি অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলাম; কিন্তু কিছুতেই শোক গ্লানি হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না। লোকে আমাকে স্তুতি করিলে সুখী হই, নিন্দা করিলে দুঃখিত হই। লাভে আমার হর্ষ হয়, ক্ষতিতে আমার বিষাদ হয়। নারদ বলিলেন, রাজন্! তুমি অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ সত্য; কিন্তু সেই কার্য্য কর নাই যাহাতে চিত্তের প্রসন্নতা হয়। একমাত্র হরিনাম গানে চিত্ত প্রসন্ন হয়। হরিগুণ গানে আপনাকে নিযুক্ত কর, তাহা হইলে তোমার দুরবস্থা দূর হইবে। "হরি" এই যে পবিত্র নাম ইহা পাপী তাপী সকলের একমাত্র গতি, পাপীদিগের পক্ষে এই নাম মধুর নাম। এই নাম সাধন কর, ইহা দ্বারা মনের বিষাদ, মূঢ়তা, দৌর্ব্বল্য

---

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

সকলই দূর হইবে। রাজা বলিলেন, তবে আমাকে উপায় বলিয়া দিন। দেবর্ষি নারদ বলিলেন, হরিনামের মহিমা না জানিলে, হরিনাম গানে রুচি অনুরাগ হইবে না। হরিনাম ভক্তিপূর্ব্বক গান এবং শ্রবণ করিলে হৃদয়ের পাপ তাপ দূর হয়। মহা জঘন্য ব্যক্তিও হরিনাম গানে মত্ত হইলে, পবিত্র হইয়া যায়। নারদ বলিলেন, হে রাজা, একটী আখ্যায়িকা শ্রবণ কর। একদিন আমি প্রয়াগ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, এক ব্যাধ একটী হরিণ লক্ষ্য করিয়াছে, আমার পদ সঞ্চারের শব্দ শ্রবণ মাত্র হরিণ পলায়ন করিল। ব্যাধ ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, কেন তুমি আমার অপকার করিলে? এই হরিণ দ্বারা আমার পিতা মাতার এবং আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে বঞ্চিত করিলে। দেবর্ষি নারদ দেখিলেন, ব্যাধের নিকটে আরও কতক-গুলি অর্দ্ধমৃত মৃগ ধড় ফড় করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি ব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইহাদিগকে একেবারে না মারিয়া অর্দ্ধমৃত করিলে কেন? ব্যাধ বলিল, আমি বাল্যকাল হইতে নিষ্ঠুরতা শিক্ষা করিয়াছি। অল্পে অল্পে কষ্ট দিয়া ইহাদিগকে বধ করিলে আমার আমোদ হয়। দেবর্ষি বলিলেন, তুমি যাহাদের জন্য এমন গর্হিত পাপ করিতেছ, তাহারা কি তোমার পাপের ফল ভোগ করিবে? এই কথা শুনিয়া ব্যাধের মন স্তম্ভিত হইল, তখনই ব্যাধ বাড়ীতে গিয়া তাহার পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি যে তোমাদের জন্য এ সকল পাপ করিতেছি, তোমরা কি এ সকল পাপের ফল ভোগ করিবে? পিতা মাতা বলিলেন, তুমি আমাদের পুত্র, আমরা কত কষ্ট করিয়া তোমাকে মানুষ করিয়াছি, এখন আমাদিগকে প্রতিপালন করা তোমার কর্ত্তব্য, আমরা তোমার পাপ ভোগ করিব কেন? এই উত্তর শুনিয়া ব্যাধ ভীত এবং ত্রস্ত হইয়া দেবর্ষি নারদের নিকটে আসিয়া বলিল, ঠাকুর, আমার কি গতি হইবে? দেবর্ষি বলিলেন, তোমার উপায় আছে। তুমি পাপ ছাড়িয়া হরিনাম গ্রহণ কর। এই কথা বলিতে বলিতে নারদ ব্যাধের মনে ভক্তি-শক্তির সঞ্চার করিলেন। কিছুকাল পর হরিনাম সাধন করিতে করিতে ব্যাধ একজন প্রধান ভক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি পর্ব্বতকে সঙ্গে করিয়া উক্ত ব্যাধের নূতন আশ্রম দেখিতে আসিলেন। নারদ এবং তাঁহার সঙ্গী মহর্ষি পর্ব্বত দেখিলেন, উক্ত ব্যাধ সস্ত্রীক হরিনাম গান করিতেছে। ব্যাধ তাঁহাদিগকে দর্শন মাত্র উত্থান করিল, কিন্তু ব্যাধের নিকটে কতকগুলি পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়া

যাইতেছিল, পাছে পিপীলিকা বধ হয় এই ভয়ে সাবধান হইয়া ব্যাধ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল। যে ব্যাধ বহু কষ্ট দিয়া মৃগদিগকে অৰ্দ্ধমৃত করিয়া রাখিত, সে ব্যক্তি এখন পিপীলিকা বধ করিতে ভয় করিতেছে! ইহা দেখিয়া নারদের বড় আহ্লাদ হইল। হরিনামের এত গুণ! অতএব হে রাজন্! যে হরিনামের এত মহিমা, তুমি সেই নাম শ্রবণ কীৰ্ত্তন কর, তোমার চিত্ত প্রসন্ন হইবে। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" জীব সকল পাপে রত, সহজে তাহাদের ভাগ্যে ধ্যানযোগ ঘটিয়া উঠে না। অতএব হরিনাম গ্রহণ কর, হরিনাম সাধন কর। পূৰ্ব্বকালের দেবর্ষি মহর্ষিগণ হরিনাম গ্রহণ করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেক শান্তি-বাচনে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ, হরি ওঁ" এই কথা বলিতেন। যে আপনাকে ঈশ্বর-ভক্ত করিতে চায়, তাহাকে হরিনাম গ্রহণ করিতেই হইবে। হরিনাম ভিন্ন জীব আর কিছুতেই সুখী হইতে পারে না। হরিনামে রাজা দুঃখী নর নারী সকলের অধিকার। হরিনাম অতি সাবধানে জপ করিতে হয়। ভক্তিভাবে চিত্তকে পবিত্র রাখিয়া হরিনাম গান করিতে হয়। চৈতন্য বলিয়াছেন, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" তৃণের ন্যায় নীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু এবং নিরভিমানী হইয়া, মানীর মান রক্ষাপূৰ্ব্বক হরি-কীৰ্ত্তন করিবে। হরিনাম আমাদের ঠাকুরঘর, হরিনাম আমাদের দেবমন্দির, হরিনাম আমাদের মধুর চাক, হরিনাম আমাদের মাতৃস্তন্য। বিশুদ্ধ ভাবে হরিনাম গ্রহণ করিলে মুহূৰ্ত্তের মধ্যে চিত্ত প্রসন্ন হয়। নামেতে হরি বৰ্ত্তমান। নামেতে তাঁহাতে প্রভেদ নাই। নাম করিলেই হরি স্বয়ং প্রকাশিত হন, হরিনাম করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই নামই জীবের ত্রাণ, সুখ-শান্তিধাম। এই নামের মধ্যে কত সুধা আছে, কেহ জানে না। এই নামে জগৎ প্রমত্ত হইবে। যতকাল পাপীর পাপ থাকিবে, ততদিন এই নামের আদর থাকিবে। দয়াল হরি আমাদিগকে আশীৰ্ব্বাদ করিয়া, তাঁহার নামে আমাদের রতি এবং মতি প্রদান করুন।